স্বপ্নের ঝাঁপি

আশাপূর্ণা দেবী

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

স্নেহের
ইন্দ্রজিৎ ও
নূপুরকে
আদরের সঙ্গে

এক

ঘটনাটা ঘটেছে একেবারে বাজারে ঢোকবার মুখে। তাই অন্ধকার ভোর থেকেই জটলা শুরু হয়ে গেছে লোকটাকে ঘিরে। মানে লোকটার লাশটাকে ঘিরে। লোকটা তো উধাও হয়ে গেছে কে জানে কখন। তবে দেখে মনে হচ্ছে প্রায় শেষ রাত্তিরের দিকেই।

ওই যে পাহাড় প্রমাণ খড় বোঝাই করা বিরাট বিরাট লরীগুলো অন্ধকার থাকতে বেরোয়, এই তো পথ তাদের। তাদেরই কেউ ওর ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে চলে গেছে। লাশটা সেই চালানোর চিহ্ন বহন করে পড়ে আছে।

কিন্তু রাস্তার মাঝখানে কেন? চলন্ত মানুষ তো নয় যে কোন এক পক্ষের অসতর্কতায় মুহূর্তে ঘটে গেছে ব্যাপারটা।

যে দেখছে সে-ই বলছে আশ্চর্য! এত খালি ফুটপাথ থাকতে লোকটা রাস্তার মাঝখানে ঘুমোতে এসেছিল কেন? না, হঠাৎ পথের মাঝখানে লটকে পড়ার চেহারাও নয়, গুছিয়ে-গাছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই শুতে আসা। লুঙ্গিটাকে চাদরের মতো বিছিয়ে পেতে, পুঁটলিটাকে মাথার বালিশ আর গোটানো মাদুরটাকে কোল বালিশ করে এমন গুছিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে, যেন নিজের বাড়ির বারান্দায় শুয়েছে।

কি অদ্ভুত ভাবেই মরেছে। দরজার পাশে-টাশে টিকটিকি চেপ্টে গেলে যেমন দেখতে লাগে, তেমনি দেখতে লাগছে লাশটাকে।

পথ চলতি লোকেরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। সেই মতলবেই এমন নির্ঘাৎ জায়গাটা বেছে নেওয়া। নইলে অতখানি ফুটপাথ থাকতে বাস রাস্তার মাঝখানে অমন রাজশয্যা বিছিয়ে অঙ্গ ঢেলে পড়ে থাকবার মানেটা কি? আরো একটা লক্ষ্য করবার মতো, শুয়েছে কিনা রাস্তার আড়াআড়ি। যেন কোন মতেই গাড়ির চাকা না ফস্কায়।

নানা জনের নানা মন্তব্য।

চলমান শহরের পথ চল্‌তি লোক যতই উদাসীন হোক, সকালবেলা বাজারে ঢোকবার মুখেই এমন একটা কুৎসিত দৃশ্য, কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বৈকি!

কিন্তু লোকটা তো ভিখিরি। অনেকেরই চেনা। এই অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করে, কতজন দেখেছে কতবার, কৌটো হাতে নিয়ে ঘুরতে। তবে? ভিখিরি কি আত্মহত্যা করে? কেউ কখনো দেখেছে কোন পথ ভিখিরিকে আত্মহত্যা করতে? আত্মহত্যার সমীক্ষার তালিকায় কোন খাঁজে-খোপে কখনো কোন ভিখিরির নাম উঠেছে?

নাঃ তেমন একখানা মর্যাদার আসন ভিখিরিদের কেউ আহরণ করে ফেলেছে, দেখা যায়নি কখনো।…আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়নোর মনোভঙ্গী থাকলে তো ওই তালিকায় শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে নতুন সংখ্যা যোগ হত। চোখ নেই, কান নেই, হাত নেই, পা নেই, বুকে হেঁটেও জীবন রক্ষার দায়ে জীবনপণ করে লড়ে চলেছে, এটাই তো পথ ভিখিরির চরিত্র।

তবে? তবে হয়তো লোকটা পাগল ছিল।

পাগলেরই কার্যকরণে কোন যোগসূত্র থাকে না। থাকে না নির্দিষ্ট কোন চরিত্র লক্ষণ। লরির চাকায় চেপ্টে যাওয়া ওই লোকটাকে যারা চিনত জানত তারা অবশ্য বলছে না, লোকটা পাগল ছিল। তারা কিছুই বলছে না, বলার অনেক দায়, মুখ খোলার অনেক বিপদ। পুলিশ আসছে শোনা যাচ্ছে যখন।

অতএব চেনারাও অচেনার দলে ভিড়ে, গুলতানি করছে। যতক্ষণ না পুলিশ এসে পড়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করছে, ততক্ষণ এই গুলতানিটা আর করবার কি আছে? লাশটাকে একেবারে একা ফেলে রেখে নিশ্চিন্তি হয়ে চলে যেতেও তো মানবিকতায় বাধছে।…পুলিশ এসে গেলেই বাঁচা যায়।

এখন ক্রমশ লোকটা সম্পর্কে মন্তব্য কমে গিয়ে পুলিশের দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে নতুনত্বটা একেবারে যায়নি,

যারা একটু বেলায় বাজারে আসে, তারা এসেই থমকাচ্ছে। হঠাৎ লাশ হয়ে যাওয়া লোকটাকে না দেখেছে কে? এই বাজারের অঞ্চলেই তো থাকে বেশ কিছুকাল থেকে।

কারো সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলে না। ভিক্ষে চাইবার ভঙ্গিটাও আধুনিক। কবে কোথা থেকে একটা কৌটো জোগাড় করেছিল, সেইটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ায়।...মানে দাঁড়াত। এখন তো লোকটা অতীতের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। দাঁড়াত। আর পাঁচ-দশ পয়সা পড়তই কৌটোয়।

অন্তত ভদ্রমহোদয়ের কাছ থেকে। অনেক সময় ঘ্যানঘ্যানানির থেকে এ রকম নিঃশব্দ প্রার্থনায় বেশী কাজ হয়। বেলা ছুটো-আড়াইটে পর্যন্ত ঘুরে কৌটোটা নিয়ে সে বাজারের আলুওলার দোকানের ধারে এসে বসত, কৌটোটা উপুড় করে ঢেলে ফেলত আলুওলার সামনে। আলুওলা ওই খুচরোগুলো গুণে নিজের কাঠের হাতবাক্সটায় ফেলে হিসেব মতো টাকা-আধুলি দিয়ে দিত।

নেহাৎ মন্দ আয় হত না, তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা হয়েই যেত প্রায়। আবার চার-পাঁচ টাকাও হয়েছে কখনো কোন দিন। হয়তো কোন দয়াবতী গাড়িবতীর গাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে জানালা দিয়ে কৌটোটা বাড়িয়ে ধরে, হয়তো মস্তানদের জটলার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে।

ওই ছেলেগুলোর মধ্যে কারো কারো মুখ দাঁড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন, বড় বড় চুল, কিন্তু এই লোকটার চুল দাড়ি গোঁফের সঙ্গে তফাৎ আছে। ওদের হচ্ছে কেয়ারি করা বাগান, এর যেন আগাছার জঙ্গল। তবু লোকটা হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে ওদের সমগোত্র ভেবে বসত কিনা কে জানে। না হলে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই অমন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকত কেন?

এমনিতে তো জানতই ওরা প্রথমেই বলবে, এখানে কেন চাঁছু? সরে পড় সরে পড়। ভুল জায়গায় এসে গেছ। এখানে সব শালার পকেটই গড়ের মাঠ। তোমার কৌটোটা মাইরি একবার ধার দাও

তা বেরিয়ে পড়ি।

বলবে, হাসবে হ্যা হ্যা করে, তারপর বলে উঠবে, কী বাবা, তুমি যে দেখছি নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু। বোবা না কালা? নাঃ মানিক, বেশীক্ষণ সহ্য করা যাচ্ছে না তোমায়—

বলে কোমর বাঁকিয়ে, কেৎরে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের পকেটের গভীর খাদে হাত চালিয়ে তুলে আনবে পাঁচ দশ কুড়ি, যা হাতে ওঠে। কারো পকেটের শেষ আধুলিটাও হয়তো চলে আসত ওই কৌটোটার মধ্যে।

মস্তানদের জটলা তো যেখানে সেখানেই। এপাড়া সেপাড়া মাঝে মাঝে দূর পাড়াতেও গিয়ে পড়ে দেখেছে, সর্বত্রই প্রায় একই রকম। কথার ভঙ্গী, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, প্যাণ্টের পকেটে হাত চালানোর ভঙ্গী সব এক। এরা কায়দা করে কথা বলে ঢের, কিন্তু কখনও বলে না, খেটে খাওগে না।

এরা হয়তো অভাবী কিন্তু গরীব নয়। লোকটা জানে এরা একটা বড় প্রতিষ্ঠান। তবে সব থেকে বেশী কোথায় কোথায় জোটে বা জুটে যায় সে প্যাঁচটা বেশ ভালোই শিখে ফেলেছিল লোকটা। তেমন পরিস্থিতির মধ্যে বেপরোয়া সাহসে ঢুকেও পড়ত। লোকটা বুঝে গিয়েছিল সবচেয়ে বেশী ভিক্ষে দেয় লোকে কারে পড়ে। মানে চক্ষুলজ্জার দায়ে।

পাশাপাশি চলেছেন প্রেমিক প্রেমিকা লেকে, পার্কে, কোন রেঁস্তোরা বা কফিহাউসে ঢোকার পথে, দেখেই বোঝা যায়, বিয়ের খোকায় এখনও খোলশ খুলে পড়েনি, পরস্পরের কাছে ভাবমূর্তিটি বজায় রাখার সাধনা চলছে। কাজেই ভিক্ষুকের প্রসারিত শীর্ণ হাতে ফট করে চলে আসে টাকাটা আধুলিটা।

বটুয়ার মুখই অবশ্য আগে খোলে। তবে বটুয়ার মুখের ফাঁস যদি খুলে পড়ে, প্যাণ্টের খোলা পকেটে হাত চালান করা ছাড়া উপায় কী? উদারতায় আর বদান্যতায়, দয়ায় আর হৃদয়বেত্তায় কে কার কাছে হেরে যেতে রাজী হবে?

মাঝে মাঝে অবশ্য কোমল কণ্ঠোত্থিত একটু ঝঙ্কারও কানে এসে যেত লোকটার, আহা আমি তো দিলাম, আবার তুমি কেন—

তার উত্তরে একটি পৌরুষ দৃপ্ত উদার কণ্ঠও কানে আসত, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

লোকটা সরে পড়বার সময় মনে মনে হাসত। জানত এঁরাই যখন জোড় ছাড়া, তখন আর ঠিক এমনটি থাকে না। বটুয়ার অধিকারিণী বাড়ানো কৌটোর সামনেও এমন একটি আশ্চর্য অলৌকিক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে যে মনে হবে জাগতিক কোন বস্তুই ওঁর দৃষ্টির আওতায় আসছে না।

আর প্যাণ্টের পকেটের অধিকারী? তিনি কড়া কটু একটি দৃষ্টি হেনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাতে তৎপর হবেন।

পথ ভিখিরিদের এ সব হৃদয় রহস্য নখদর্পণে।

আরো একটা বড় মওকা রেড সিগন্যালে দাঁড়িয়ে পড়া গাড়ির লাইনের ধারে।

গাড়ির মধ্যে একই পরিবারের লোক রয়েছে, নাকি কেউ কোন বিশিষ্ট বন্ধুজনের সঙ্গে চলেছে, এটা আর সব ভিখিরিরা বুঝতে পারে কিনা কে জানে, এই লোকটা পারত। যে লোকটা এখন দরজার পাশে পিষে যাওয়া টিকটিকির মতো চেহারা নিয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।

ও জানত কৌটোটা কোন্ গাড়ির জানালা দিয়ে গলিয়ে দেওয়া কার্যকরী। নির্ঘাৎ চলে আসবে আস্ত টাকা, এমন কি তেমন দীনহীন বস্তু পকেটে না থাকলে, দু'টাকার নোট পাঁচ টাকার নোট।

আবার তৎক্ষণাৎ স্টিয়ারিং হুইল ধরা দু'খানা হাতের একখানা চলে যাবে পকেটের পার্সের চেন খুলতে—ভাবটা তুমি আমার গাড়িতে বসে, আমার নাকের সামনে দান খয়রাতের বাহাদুরী দেখাবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব?

লোকটা এই সব ঢিলে জায়গায় প্যাঁচ কসতে বেশ দক্ষ ছিল। কাজেই 'বাবু বড় খিদের জ্বালা' অথবা 'মাগো আজ তিনদিন কিছু

খাই নাই' বলে ঘ্যান ঘ্যান না করেও আয় উপায় মন্দ করত না। হঠাৎ একদিন ওর গায়ে নতুন গেঞ্জি দেখা গিয়েছে, একদিন নতুন পায়জামা। ওই যে লুঙ্গিটা পেতে জুৎ করে বিছানা বানিয়েছিল ওটাও তো প্রায় নতুন···অবিশ্যি ওটা কিনতে একটু কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছিল, যা দাম জিনিস-পত্রের।

আলুওলার কাছ থেকে রেজগিগুলো বাঁধিয়ে নিয়ে লোকটা চলে যেত বাজারের দীনবন্ধু পালের হোটেলে। হোটেল বলতে যা বোঝায় তেমন ঢালাও কারবার নয় ব্যাপারটা, তবু বাজারের ফড়েদের মুখে মুখে ওই নামটা চালু হয়ে গেছে।

ঘরভাড়ার পাট নেই, লাইসেন্সের দায় নেই, বাজারের পিছন দিকে মাটিতে ময়লা ন্যাকড়া পেতে বসা দীনহীন পশারিদের কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা তেঁতুল, শুকনো আদা, মশা খেকো পাতিলেবু আর অনামি শাকের আঁটিদের গা বাঁচিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে দীনবন্ধুর মাটির বাসনের বড় সড় চালা। মাচা বেঁধে বেঁধে দু-তিন থাকে সাজানো সব জিনিস। কলসী কুঁজো হাঁড়ি মালসা থেকে খুরি গেলাস ফুলগাছের টব, ইস্তক মঙ্গলচণ্ডীর সরা ইতুর ঘট সব। এই সব মালপত্রের মধ্যেই একধারে উনুন জ্বেলে দীনবন্ধু তার নিজের জন্যে আর ভাগ্নের জন্যে রান্না করত।

ক্রমশ আস্তে আস্তে ডজন দেড়েক খদ্দের জুটে গেছে দীনবন্ধুর। তারা সকালবেলা কোন এক সময় বলে যায়, আর দুপুর বেলা নগদ পয়সা দিয়ে খেয়ে যায়। সবাই বাজারের ফড়ে। দুপুরে এখানে সেখানে তোলা উনুন জ্বেলে নিজের নিজের ভাত ফুটিয়ে নিত, কেমন করে যেন এখানে এসে ভর্তি হয়ে গেছে। লাভ দু' পক্ষেরই। তাদেরও হাঙ্গামা বাঁচে, দীনবন্ধুরও পয়সা বাঁচে। ওদের থেকেই মামা ভাগ্নের খাই-খরচাটা উঠে আসে।

তাছাড়া দীনবন্ধু লোকটা রাঁধতে বাড়তে ভালবাসে। শুধু মামা ভাগ্নের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে, শখটার পরিতৃপ্তি হত না, এতে হচ্ছে।···নিজে থেকেই দু-একজনকে বলেছে, এত হ্যাপা পোয়াচ্ছিস কেন, আমি তো

রাঁধছিই, তোর চাল ক'টাও একসঙ্গে ফুটিয়ে দেব, দিয়ে যাস।

কিন্তু শুধুই তো চাল ফোটানোয় রোজ চলে না, আস্তে আস্তে পয়সার মাধ্যম ব্যবস্থাটা চালু হয়ে গেছে।

নিজের দোকানেরই হাঁড়ি সরা গেলাশ খুরি, অসুবিধে নেই। ফাটা-টাটা কানা ভাঙাগুলো দিয়ে কাজ চলে যায়, শুধু তোলা উনুন কিনতে হয়েছে দুটো।

বলতে গেলে লাভের ওপরেই আছে দীনবন্ধু। এই হোটেলেই খেতে আসত লোকটা। ওর সম্পর্কে কিন্তু শর্তটা শিথিল ছিল। সকালবেলা বলে যাবার দায় ছিল না ওর। ও বাঁধা খদ্দেরই ছিল, এদিক ওদিক হত না। আসত সকলের পরে। সবাইকে পার করে ভাগ্নেটাকেও খাইয়ে দোকানে বসিয়ে দীনবন্ধু যখন নিজে খেতে বসত, তখন লাকটা এসে বসত একখানা শালপাতা হাতে করে, যেমন সবাই আসে। শালপাতার পাশে একটা টাকা আর পঁচিশটা পয়সা নামিয়ে রেখে তাকিয়ে দেখত দীনন্ধুর কতদূর।

দীনবন্ধু টাকা-পয়সাগুলো তুলে ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে বলত, তোর একেবারে ফেল কড়ি মাখ তেল, পরেই দিতিস। পালাচ্ছিস না তো।

লোকটা তার সঙ্গে সাথী পুঁটুলিটাকে কোলের মধ্যে চেপে বাবু গেড়ে বসে বলত, পরেই বা কি, আগেই বা কি? দেওয়া নিয়ে কথা।

দীনবন্ধু কখনো এ কথাও বলত—শুধু টাকাই রাখ, পঁচিশটে পয়সা তোকে আর দিতে হবে না।

লোকটা শালপাতার উপর ঢেলে দেওয়া ভাতগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলত, সবাই তো ওই দেয়।

দীনবন্ধু হাসত, সবাই তো ভাতেই মেরে দেয়। পাঁচসিকে পয়সা চালেই উসুল করে নেয়। তুই ওদের সিকিও খাস না।

লোকটা বলত, তা বললে কি হয়, রেট বলে কথা।

ওরা লোকের গলা কেটে রোজগার করছে।

লোকটা একটু হেসে বলত, গলা আমিও কাটছি। লোকের না হোক নিজের।

তোর সব কথায় হেঁয়ালি। আর একটু ডাল দিই ?

উঁহু না।

চচ্চড়ি ?

নাঃ! আর কিছু লাগবে না।

গণশা বলছে চচ্চড়িটা ফাস্টো কেলাশ হয়েছে। নে আর একটু।

তবে দাও।

দীনবন্ধু বেশ বড় এক খাবলা পাতে ফেলে দিত। চচ্চড়িটা তার প্রায় মুফতেই হয়। যারা খেতে আসে, তারা নিজের তলানি মাল নিয়ে আসে কিছু কিছু এমনই। কুমড়োটা, বেগুনটা, ঝিঙেটা, মুলোটা, ডাঁটাটা। পরদিন সেগুলোর সদ্ব্যবহার হয়। সেটাই প্রায় আসল। দশের লাঠি একের বোঝা।

কেন কে জানে লোকটাকে সুনজরে দেখত দীনবন্ধু। কোন কোন দিন লোকটা তার অভ্যস্ত নীরবতা ত্যাগ করে হয়তো শালপাতাটা বিছিয়ে বলত, আজ কি রেঁধেছ দীনবন্ধুদা ?

দীনবন্ধু মন খুলে বলত, খ্যাঁসারির ডাল, পুঁইপাতার ল্যাবড়া, করলার ঝাল, আর কাঁচা তেঁতুলের টক।

লোকটাও হঠাৎ হঠাৎ কোন দিন মন খুলত। বলত, বাঃ বাঃ! শুনে খিদে বেড়ে যাচ্ছে।

দীনবন্ধু হয়তো তখন গলা নামিয়ে বলত, ছানা-ট্যাংরার সর্ষের ঝাল রেঁদেচি, সবার সুমুকে বের করিনি। গণশা আড়াল করে খেয়ে গ্যাচে, আর তোর আমার তরে রেকেছি।

লোকটা ভাতের গ্রাস হতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত, আঁর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলত, তুমি আমায় এমন স্পেশাল ভালোবাস কেন দীনবন্ধুদা ?

উদাস উত্তর শুনতে পাওয়া যেত—ভালোবাসা আর কি ? তোকে দেখলে মনে হয় যে ভাবে তুই বেড়াস সত্যি তা নয়। যেন ভদ্দর ঘরের ছেলে। তাই মনটা কেমন পোড়ে।

ওটা তোমার ভুল ধারণা দীনবন্ধুদা—লোকটা গব গব করে ভাতের

গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে বলত, আমি স্রেফ রাস্তার ছেলে। রাস্তাই আমার মা বাপ।

তা হবে—বলে দীনবন্ধুও খাওয়ায় মন দিত।

অবশ্য শেষ-মেশ আরো একবার জিজ্ঞেস করত লোকটাকে আর ভাত নেবে কিনা। এই—ওই—ওরে—হ্যাঁরে। এতে কি জুৎ হয়? দীনবন্ধু একদিন জিজ্ঞেস করল, তোর নামটা কি একবার বলত শুনি?

নাম? আকাশ থেকে পড়ল লোকটা—রাস্তার ছেলের আবার নাম কি গো—দীনবন্ধুদা? কে তাকে হোম যজ্ঞি করে নাম দিতে যায়?

আহা, বলি মা মাসি কেউ তো ছেল একদা ভুঁইফোঁড় তো নয়? ডাকত তো কিছু বলে?

ভুঁইফোঁড়। ভুঁইফোঁড়ই।

তবে তোকে ওই নামেই ডাকব। ভুঁইফোঁড়। হেসে ফেলল দীনবন্ধু।

লোকটা বেজার গলায় বলল, নামে কি দরকার? নাম না থাকলে তুমি ভাত দেবে না?

এই ছ্যাকো। তুই বাপু বড্ড রাগী। বেশ বাবা, এই ওইই ভালো।

হ্যাঁ তাই ভালো। রাস্তায় যে কুকুর ছাগলগুলো ঘোরে, তাদের নাম আছে? বলে পাতাটা মুড়ে নিয়ে উঠে যায় লোকটা।

কিন্তু তারপর যা একখানা কাজ করতে বসে সে, সেটা একেবারেই তার পরিচিতির বিরোধী। খাওয়ার পর হাঁড়ি কলসীর মাচার আড়ালে একটা কোণ ঘেঁসে বেড়ার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একখানা খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে। খাতাটা শক্ত মলাটে বাঁধানো, পেন্সিলটা নামী দামী।

এইটা তার নিত্য কাজ। বিকেলে ভোরে ওই নিয়েই থাকে। কৌটো নিয়ে বেরোয় আবার সেই সন্ধ্যে নাগাদ।

পেন্সিলটা ক্ষয়ে গেলে মাঝে মাঝে ফলওলাদের দোকান থেকে কাটিয়ে আনে তাদের আম, ডালিম বেদানা কিংবা আঙুরের বাঁধন কাটা ছুরি দিয়ে। আর পেন্সিলটা শেষ হয়ে গেলে কোন স্টেশনারি

দোকানের ধারে গিয়ে বলে, একটা ভালো পেন্সিল দেখি। চেয়ে মেগে নেয় না, দাম দিয়ে দেয়।

দীনবন্ধুর ভাগ্নে গণশা পড়তে জানে না তবু মাঝে মাঝে ওর খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, কী এত নিকিস রে?

লোকটা তাড়াতাড়ি খাতা মুড়ে ফেলে বলে, এই খবরদার!

গণেশ হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, পেয়সীকে পেরেম পত্তর নিকিস বুজি? তাই এত মুকোচ্ছিস?

লোকটা কড়া চোখে তাকিয়ে বলে, অসভ্যতা করতে এলে মেরে শেষ করে দেব। এর বেশী নয়। মুখ খারাপ করতে দেখেনি কেউ কখনও তাকে।

কখনও দীনবন্ধুও বলেছে, গণশা বলে তুই না কি রোজ খাতা নিকিস। কী নিকিস রে?

লোকটা উত্তরটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে, লিখি আবার কী? এই আঁকি বুঁকি হিজিবিজি সাপ ব্যাং। পাগল ছাগল বৈ তো না।

তা কেউ কেউ অবশ্য তাকে পাগলই বলে। মানে বলত। ওর পুঁটুলি বওয়াটা দেখে বলত। তবে সামনা সামনি নয়, আড়ালে। সামনে তেমন সাহস পেতো না। লোকটা শুধু গম্ভীর বলেই নয়, দেখতেও কেমন রুক্ষ।

কিন্তু ওর পরণ পরিচ্ছদ দেখলে পাগল ছাড়া কী বা বলা যেতে পারত। কখনও একটা জরাজীর্ণ পায়জামার সঙ্গে একটা ফর্সা গেঞ্জি, কখনও একটা ধুলধুলি শার্টের সঙ্গে একখানা নতুন পায়জামা। আর এখন রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা লাশটার গায়ে যার চিহ্ন লেগে রয়েছে সে দুটো একদা শার্ট প্যান্টই ছিল বটে, এবং ভালো জিনিসই ছিল মনে হয়, কিন্তু আপাতত গোটা কতক ফালিমাত্রে পরিণত, যেমন দেখা যায় রাস্তার পাগলদের গায়ে।

তাছাড়া পেটেন্টে পাগল মার্কা ওই এক পুঁটুলিটাকে একদণ্ড কাছছাড়া করবে না। চান-টান করার সময় যে কোথায় লুকিয়ে রাখে ভগবান জানেন।

মানে জানতেন।

দীনবন্ধুর কৌতূহল বেশী, সে প্রায়ই জিগ্যেস করত, কী আছে রে তোর পুঁটলিতে? একদণ্ড কাছ ছাড়া করিস না।

লোকটা অগ্রাহ্যের গলায় বলত, সাপ ব্যাঙ আরশোলা টিকটিকি।

সেই বস্তু তুই সাতরাজার ধন এক মানিকের মতন বুকে করে বেড়াস?

তো আমি যেমন আমার সম্পত্তিও তেমন।

নিঘ্‌ঘাত কোন ঠাকুর দেবতার পট।

ভূতে পেয়েছে আমায়?

তবে বুঝি তোর বৌয়ের ফটোক? বৌ মরে যাওয়ায় বেবাগী হয়ে বেড়াচ্ছিস।

দূর। মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা।

তা জামা কাপড়ের মধ্যে আছে তো একটা ছেঁড়া পায়জামা দুটি ফুটো গেঞ্জি—তার এত যত্ন খাতির?…একদিন খুলে দেখা না বাবা। পেটে গুড়গুড়ুনি কমে।

লোকটা হেসে ফেলত একছিটে।—এত কৌতূহল?

হঠাৎ একদিন বলে উঠল, কিসের পুঁটুলি জানো দীনবন্ধুদা? আমি বলি স্বপ্নের পুঁটুলি।

হরিবল! স্বপ্নের অ বার পুঁটুলি কি রে? স্বপ্নকে কি পুঁটুলিতে পোরা যায়?

যায়, দীনবন্ধুদা যায়।

তা দেখা না একদিন খুলে।

লোকটা কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মুখ করে বলেছিল, দেখাব। যেদিন স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাবে, তোমাকেই আগে দেখাব।

একে লোকে পাগল বলবে না তো কি বলবে? উনপঞ্চাশ রকমের নাকি পাগল আছে। এও তার মধ্যে একরকম।

সেই পুঁটুলিটা, কদাচ যেটা কাছ ছাড়া করত না, সেটাকে এখন মাথার তলায় নিয়ে মরেছে।…অবিশ্যি মরেছে কি নিহত হয়েছে সেটা

ভবিষ্যতের বিচার সাপেক্ষ।...মুখে মাছি উড়িয়ে সেই বিচারের আশায় পড়ে আছে মড়াটা।

দৃশ্যটা বড় দৃষ্টিকটু। অনেকেরই মনে হচ্ছে একটা চাদর-টাদর কিছু ঢাকা দিলে হত ওর ওপর। কিন্তু কে এগিয়ে আসবে ঢাকা দিতে? কার শখ হবে খাল কেটে কুমীর আনতে?...যাকে চেনো না শোন না, জীবনে কখনো চোখে দেখেছ কিনা মনে করতে পারছ না, তার মড়ায় চাদর ঢাকতে আসবার দায় তোমার পড়ল কেন হে?

কেউই আসে না। তবে দেখতে বিতিকিচ্ছিরি লাগছে। হলেও মড়া; একটা মনুষ্য শরীর তো? ওর না হয় জ্ঞান নেই, জলজ্যান্ত লোকগুলোর তো আছে?

দেখতে বিতিকিচ্ছিরি লাগাটা কারও কারও অসহ্য ঠেকে। ওই অসহ্য ঠেকার জন্যে কত দিন আগে যেন এক বাজার অভিমুখী ভদ্রলোক তার বাজারের থলিতে করে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন একখানা পুরনো ধুতি আর একটা ঘাড়ছেঁড়া শার্ট। ওর কাছাকাছি এসে সে দুটো বার করে বলেছিলেন, ওহে, তোমার জামা পেণ্টুলুন তো ছিঁড়ে ফালি ফালি, এই দুটো নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে। পরে ফেল তো বাপু।

কিন্তু পাগলের মতি বুদ্ধি। ভদ্রলোকের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে 'না!' বলে চলে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক তো হাঁ। যাঃ বাবা! কৌটো পেতে ভিক্ষে করে তো বেড়াস, তাতে অহঙ্কারে ঘা লাগে না?

তারপর দিন থেকে পর পর তিন-চার দিন তার শরীরটা বেঠিক হল। খেতে এলো না। দীনবন্ধু খুঁজে খুঁজে দেখা করে বলল, কি হল? আসছিস না যে?

কিছু না, এমনি। শরীরটা বেঠিক।

চান তো করেছিস মনে হচ্ছে।

চান না করলে বাঁচি না।

দেকিস বাবা, সাবধান। দিন কাল খারাপ।

পরের দিন একখানা নতুন লুঙ্গি জড়িয়ে এসে খেতে বসল।

দীনবন্ধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলল, তিন দিনের ভাত খরচ বাঁচিয়ে লুঙ্গি কিনলি ?

লোকটা চমকে উঠল। তারপর ফিকে ফিকে হেসে বলল, কী যে বল !

এ'কদিন খেলি কী ?

গ্র্যাণ্ড খেয়েছি। মুড়ি ছাতু কাঁচা লঙ্কা।

দু'দিন ধার রাখলে দীনবন্ধুদা খেতে দিত না ?

কী মুশকিল ! বলছি যে শরীর ঠিক ছিল না।

তদবধি সেই লুঙ্গিটাই লজ্জা নিবারণে সহায় হয়েছিল। গতকাল রাত্রে ওর সেই ওরিজিন্যাল ছেঁড়া শার্ট প্যাণ্টই আবার গায়ে চড়িয়ে লুঙ্গিখানাকে রাস্তায় :পেতে শুয়েছিল। সেটাও এখন একটা দলা পাকানো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো দেখতে লাগছে লাশটার আশপাশ থেকে।

বাজারের প্রায় সকলেই তো চেনে ওকে, তবু এদিকে ঘেঁসছে না। প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে আছে। কে না জানে বাঘে ছুলে যদি আঠারো ঘা, তো পুলিশে ছুঁলে আটত্রিশেব কম নয়। তা ছাড়া নিজের কাজ নেই ? কাজকর্ম ফেলে কে আর তামাসা দেখবে ?

মায়া মমতা ভালোবাসা মানবিকতা এই রকম কিছু কিছু শব্দ আছে বটে জগতে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তো আর সাধারণ লোকের চলে না। সাধারণ লোকের হয়তো হঠাৎ বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠছে, হয়তো মনে হচ্ছে কবে যেন ওর সঙ্গে ব্যবহারটা ভালো করা হয়নি, হয়তো লোকটাকে আর দেখা যাবে না৷ ভেবে মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

এর বেশী আর কি হবে ? যে যার কাজের ধান্দায় সরে গেলেও এই অদ্ভুত কুৎসিত দৃশ্যটার ছায়া চোখের সামনে থেকে নড়াতে পারছে না।

কখন পুলিশ আসবে ? কখন লোকেরা ওই দৃশ্যটার হাত থেকে মুক্তি পাবে ? ভয়ও আছে যদি না আসে তো কী হবে ? ওই দৃশ্যটা থেকেই যাবে ? লাশ পচবে ? পাড়ার স্বাস্থ্য খারাপ হবে ?

না অতদূর ভাবার কিছু ছিল না। পুলিশ দুজন এলো বৈ কি। আর এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কোথা থেকে যেন ফোন করে এলো। কিছুক্ষণ পরে আর একজন এসে হাজির হল। ঘটনাটা যেন সাদাসিধে অ্যাকসিডেণ্ট মাত্র নয়।

এতক্ষণ যারা জটলা করছিল তারা পুলিশ দেখেই সরে পড়ল। যারা থেকে গেল তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

লোকটাকে কেউ চেনো?

না। না তো।

কোন দিন দেখনি?

কে জানে দেখেছি কি না। পথের ভিখিরির মুখ কে মনে রাখে?

মুখটা কিন্তু আস্তই রয়ে গেছে। চাকা চলে গেছে পেটের উপর দিয়ে। রাস্তায় আড়াআড়ি শুয়ে ছিল তো।

দেখে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে গাড়ির চাকায় জান দিতে এসেছিল, নয় কোন দুশমন ওর জানটা নিয়ে তারপর রাস্তায় সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল লোক ঠকাতে। কোন শত্রু ছিল ওর?

কী করে বলব?

কোন মেয়েছেলের সঙ্গে মিশত?

কক্ষনো না। না, মানে ইয়ে—দেখিনি তো? কি ভাবে জানব?

শুনলাম এই অঞ্চলেই ঘুরত।

ঘুরতে পারে। কে কার চরকায় তেল দেয়?

দু-একজন ভদ্র ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, এক আধদিন যেন বাজারের মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরতে দেখেছি লোকটাকে।

তবে? তবে তো বাজারের মধ্যের লোকদের সাক্ষী ধরা যেতে পারে। ডাকো ওদের। পুলিশ ডাকছে শুনলে আসতেই হবে। কিন্তু বুক থরথরিয়ে নয়। এ যুগে ভদ্দর ভিন্ন সকলেরই বুকের পাটা শক্ত হয়ে গেছে।

সেই শক্ত পাটা থেকে ছটপট জবাব—কে কোন্‌দিন বাজারে ঘুরেছে, সে হিসেব রাখতে যাবে, এত সময় কার? দায়ই বা কিসের?

আলুওলা বলল, জীবনেও দেখেনি ওকে।

ফলওলা বলল, মুখটা দেখে মনে হচ্ছে বটে যেন দেখা দেখা— হয়তো ভিক্ষে চাইতে এসেছে কোন দিন।

মাটির বাসনের মূল মালিক তখন কাছাকাছি ছিল না, কর্মচারী গণশা বলল, পথের ভিকিরিদের সবাইকে যদি চিনে রাকতে হয় তাহলে তো নাচার।

আরো কিছু কিছু লোকও এই একই ধরণের এজাহার দিল। কাঁচা তেঁতুল আর কাঁচা লঙ্কাওয়ালী বুড়িটা লাশটাকে দেখে মাথা নাড়ল, সাতজন্মে দেখেনি।

অতএব ধরে নিতে হচ্ছে লোকটাকে কেউ চেনে না, জানে না, দেখেনি। কাজেই পুলিশ তার নোট বুকে লিখে নিল, অজ্ঞাতনামা ভিখারি, বয়স (অনুমান) ত্রিশ, লরী অথবা ভারী কোন গাড়ির তলায় চাপা পড়ায় পিষ্ট।···সঙ্গে পাওয়া গেছে একটা মাদুর, একটা, লুঙ্গি একটা পুঁটুলি।

পুঁটুলির মধ্যে—এইখানেই হোঁচট খেতে হয়েছে পুলিশ মহোদয়কে। ভিখিরির ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলির মধ্যে রাশি রাশি টাকা পাওয়া যেতে দেখার অভিজ্ঞতা পুলিশের আছে, কিন্তু এ ধরণের জিনিস? মনে তো পড়ছে না।

পার্শ্ববর্তী সহকারীর দিকে ভুরু নাচিয়ে তাকিয়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

সহকারী গলা নামিয়ে বলল, ব্যাপারটা খুব সোজা বলে মনে হচ্ছে না স্যার। পোস্ট মর্টেমে বোঝা যাবে। পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু সেফটি রেজারের ব্লেড দিয়ে কি—

অসম্ভবও নয়। মোক্ষম কোন আর্টারি কেটে দিতে পারলেই তো। তাছাড়া খাতাটা? সবটাই তো দেখা যাচ্ছে কোড ল্যাঙ্গোয়েজ।

বলছ তাই?

তাছাড়া আর কিস্যু নয়।

সাবান-ফাবানগুলো?

সহকারী বলল, ওগুলো লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য।

তার মানে এর থেকেই বড় একটা গ্যাং ধরে ফেলা অসম্ভব নয়।

চেষ্টা করলে কোন কিছুই অসম্ভব নয় স্যার। তবে মুশকিল হচ্ছে কি, লোকটা মরে গিয়ে মুখে তালা-চাবি লাগিয়ে ফেলেছে। ধোলাই দিয়ে কথা আদায় করার উপায় রাখেনি।

স্যার বললেন, সেই তো মুশকিল। তবে সন্দেহ হচ্ছে তালা-চাবিটা দোস্তরা কেউ লাগিয়ে দিয়ে চিহ্ন লোপাট করতে রাস্তায় শুইয়ে রেখে গেছে।

স্যার যা বলেছেন! তবে আমার মনে হয় স্থানীয় লোকেরা কিছু জানে। স্বীকার পাচ্ছে না।

আচ্ছা দরকার হলে স্বীকার পাওয়ানো যায় কিনা দেখা যাবে। এখন বাকিটা লিখে নাও। সঙ্গের পুঁটুলির মধ্যে—

১। সেলোফেন প্যাকেটে মোড়া একটা নতুন ক্রীম কালার বুশ শার্ট ও একটা ব্লু টেরিকটের ট্রাউজার। ২। একখানা ছোট নতুন টার্কিশ টাওয়েল। ৩। একখানা নতুন মার্গো সোপ। ৪। একটি সেভিং-সেট, দুখানা নতুন ব্লেড, (যেটা বিশেষ সন্দেহ জনক।) ৫। একটি ছোট হাত আয়না। ৬। একটি সরু চিরুণী। ৭। একখানা বাঁধানো খাতা।···খাতায় সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত নানা হিসাব-পত্র।

একে তুমি ভিখিরি বলবে? স্যার তাঁর লোমশ জোড়া ভুরু উঁচিয়ে বলেন, রহস্য গভীর।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে স্যার। ভোল বদলাবার সাজ-সরঞ্জাম সব মজুৎ! হয় খুন করে ফেরার নয় পলিটিক্যাল ব্যাপার—

খাতাটায় কিন্তু আগাগোড়াই টাকার হিসাব। কাকে কাকে কত দেবে তার ব্যবস্থা। বখরার ব্যাপারই মনে হয়।

ডাকাতি-ফাকাতিও হতে পারে। কিন্তু স্যার লক্ষ্য করেছেন, টাকার অঙ্কটা কোথাও বসানো নেই।

তাইতো দেখছি। তাহলে?

তাহলে যে কি, সেটাই বার করতে হবে এখন আমাদের। এই

থেকে যে কী বার হয়ে পড়ে কে জানে।

স্যার বললেন, যাক এখন লিখে নাও। খাতার সমস্তই টাকার হিসেব। কারো চোখে পড়ে গেলে পাছে সন্দেহ করে বসে, তাই ফার্স্ট পেজে বড় বড় করে লিখে রেখেছে—'লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পেলে—জীবনের ঋণ শোধ!'

উঃ ভাষাটা কেমন চালাকির দেখেছেন? জীবনের ঋণ! যেন কবিতা লিখছে, মামাকে অন্নঋণ বাবদ—

ভজু কাকাকে, কলেজের মাইনে বাবদ—

সুধা মাসিকে জামা কাপড় বাবদ—

নোটোদের দোকানে প্রতি দিন দু'বেলা চা বাবদ—

সাহেব বাঘা মুখে কুটিল হাসি হেসে বললেন, একের নম্বর ঘোড়েল। মামা কাকা দাদা মাসি, একেবারে নিরীহ ব্যাপার।...শালা শয়তান কতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিল কে জানে।...শালা লাশ হয়ে গিয়ে হাত ফস্কে পালিয়ে গেল।

কিন্তু হাতের লেখাটা দেখেছেন স্যার? ইংরিজিও জানে বেশ। লেখাপড়া জানা তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রঘরের ছেলেই হয়তো—

হয়তো কেন? নিশ্চয়। আজকাল তো যত ক্রিমিন্যাল আসছে ভদ্র বাড়ি থেকে।...শুধু পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপারেই নয়, স্রেফ, চুরি, জোচ্চুরি, ডাকাতি রাহাজানি, খুন জখম, সব কিছুতেই।

স্যর! দেদার লেখা। মাঝে ক'খানা শাদা পাতার পর আবার দেখছি—পাতার পর পাতা!...

মার নামে স্মৃতি মন্দির—

দাদাকে মাসে মাসে হাত-খরচ—

বুলর বিয়ের জন্যে অনেক—

ওঃ! স্যার চণ্ডী পুজো থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত। আর নিজের জন্যে তো এলাহি কারবার।...এ স্যার কোন ব্যাঙ্ক ডাকাতির তাল। না হলে এত হয় না।...লটারী! ফুঃ!...বাজারের লোকগুলো মহা হারামজাদা। কেউ মুখ খুলল না।

এই সময় হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর আবির্ভাব ঘটল। সকাল থেকে কোথায় যে ছিল কে জানে। এদিক-ওদিক থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আচমকা এগিয়ে এসে বলে উঠল, খাতায় কি সত্যি কিছু নেকা আছে স্যার? না শুদুই হিজিবিজি?

লোকটার প্রশ্ন শুনে পুলিশ সাহেবের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে ওঠে। কড়া গলায় বলেন তুমি কে?

অ্যাঁ! আমি? আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না? তুমি কেউ না?

আজ্ঞে আমি মানে, একটা তুচ্ছ মানুষ তাই বলচি।

কি কর তুমি?

আজ্ঞে বাজারের পেছনে আমার মাটির বাসনের দোকান আছে।

ও। তা এতক্ষণ দেখিনি তো!

ছিলাম না সার। ইয়ে মেয়ের বাড়ি গেছলাম। এইমাত্তর ফিরলাম। ফিরেই দেকচি এই সব কাণ্ড!

লোকটাকে চেনো?

মোটেই না হুজুর। কস্মিন কালেও না।

পুলিশ সাহেব ওর ওই তৎপর জবাবে আরো তীক্ষ্ণ হন, তীব্র হন, উগ্র হন।

তবে খাতায় কি লেখা আছে তাতে তোমার কি দরকার পড়ল?

কিচু না, এমনি!

ওঃ। এমনি? হুঁঃ। খাতায় বখরার হিসেব লেখা আছে, বুঝলে?

দীনবন্ধু বোকার মতো বলে ফেলে, বখরার হিসেব? কিসের বখরা?

পুলিশ সাহেব তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন ওই বোকাটে মুখটার দিকে। সব থেকে ঘোড়েলরাই নিরেট মুক্ষো হয়। তারপর বলেন, লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পেলে কাকে কি দেবে, তার হিসেব। নিজের জন্যেও আছে, মোটর গাড়ি থেকে রুমাল পর্যন্ত, বাকি রাখেনি কিছু। তা তুমি তো লোকটাকে চেনো মনে হচ্ছে?

আমি! দীনবন্ধু আৎকে ওঠে, আমি কেন চিনতে যাব?

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? মানুষ মানুষকে চেনে না?

তারপর খাতার পাতা উল্টাতে গম্ভীর গলায় বলেন, এই বাজারের দীনবন্ধু বলে কাউকে চেনো?

অ্যাঁ! না, না তো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চমকানো গলায় কথাটা বলেই হঠাৎ আলগা গলায় বলে ফেলে দীনবন্ধু, মানে আমার নামও দা।—দীনবন্ধু—পা—

হুঁ! বুঝেছি। আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

ক্যান—ক্যান বাবু। আমার সঙ্গে কি?

তোর সঙ্গে কি, তা থানায় গিয়েই টের পাবি।

মুহূর্তে 'তুমি' 'থেকে' তুই-তে নামায় আরো বিচলিত হয় দীনবন্ধু, প্রায় কেঁদে ফেলে বলে, আমায় ছাড়ান ছ্যান সায়েব। সত্যি বলচি আমি ওকে জানি না।

চিনিস জানিস না? এদিকে খাতায় লেখা রয়েছে লটারীতে টাকা পেলে ও বাজারের দীনবন্ধুদাদাকে অনেক টাকা দেবে।

দীনবন্ধুর চোখের তারা দুটোয় হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে যায়। আর দীনবন্ধু হঠাৎই এখন বেশ শক্ত হয়। বলে, ও অন্য কেউ হবে। আমার সঙ্গে ওর জানা নাই, কিসের সুবাদে টাকা দিতে যাবে?

কিসের সুবাদ, সেটাই বার করা হবে। চল হারামজাদা শুয়োর!

সন্দেহজনক ব্যক্তি পরিচয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হয় দীনবন্ধুকে। লাশটাকে ওঠানো হয় মুদ্দফরাসের হেফাজতে।

বাজারের আর কারও চিহ্নমাত্র নেই রাস্তায়, তারা আড়ালে বসে দীনবন্ধুর বোকামিকে ধিক্কার দিতে থাকে, আর গালমন্দ দিতে থাকে।

তোর কি দরকার ছিল রে হতভাগা মুখ্যু খাতায় কি লেখা আছে জানতে যাবার? এখন পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে মুখ খুললে তো সবাইকে ফাঁসাবি। আমরা প্রত্যেকে বলেছি ওকে কেউ চিনি না।... নিঘ্‌ঘাত ওই হারামজাদা দীনবন্ধুর হোটেলের খাওয়া-ফাওয়ার কথা প্রকাশ করে বসবে।...উঃ! লোকটাকে মেরে লাট করতে ইচ্ছে

করছে। গণশাকে ডেকে তম্বি গম্বি করে সবাই।

গণশা মামার মতো বোকা নয়, বলে বসে—না মামা পাগলাটাকে বড় ভালোবাসত বলেই। স্রেফ গম্ভীর ভাবে বলে, আমি তার কি করব? আমায় সাসাতে আসছেন কেন?…

সবাই গুম হয়ে যায়।…আজ আর কারো কাজ কর্মে উৎসাহ নেই। এতক্ষণ লোকটা ছিল মনোভঙ্গের কারণ, এখন আর তার কথা কেউ ভাবছে না, নিজেদের কি বিপদ হতে পারে তাই ভাবছে।…

পাড়ার সেই ছোঁড়া ধুতি জামা দান করতে আসা ভদ্রলোক বাড়ি ফিরে বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে বললেন, ব্যাপারটা সুইসাইড।… পুলিশের ওই সন্দেহ বাজে। কেউ খুন করে সাজিয়ে রেখে গেলে, মাথার নীচে পুঁটুলিটা রেখে যেত না।…

বাড়ির কেউ বলল, ভিখিরি কখনো সুইসাইড করে? শুনিনি কখনো।

তার মানে জাত ভিখিরি নয়। মাথার গোলমালে হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।…সেদিনই আমার ভালো ঘরের ছেলে বলে সন্দেহ হয়েছিল।…

না, আজ আর বাজার ভেতর লোকেরা বাজার দরের অগ্নিজ্বালা নিয়ে আলোচনা করছে না। প্রসঙ্গ ওই লোকটা। শহরে যখন তখন লোকে গাড়ি চাপা পড়ছে, মরছে। কে কার কথা নিয়ে ভাবতে বসে? …আহা! এই পর্যন্ত। কিন্তু এ লোকটা তো হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়েনি গাড়ি চাপা পড়তে এসেছিল সেজে গুছিয়ে! তাই কিছুক্ষণ তার কথা!

তবে কতক্ষণ? রোদ চড়া হয়ে ওঠে। অনর্গল গাড়ির স্রোতের চাকায় চাকায় রাস্তার মাঝখানের সেই কালো হয়ে যাওয়া শুকনো রক্তের দাগটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

শুধু আমোঘ নিয়তির দিকে এগিয়ে যাওয়া অস্নাত অভুক্ত দীনবন্ধু নামের নির্বোধ লোকটা থানার বারান্দায় আটকে পড়ে থেকে মনে মনে মাথা খুঁড়তে থাকে, এত সব আলটু-বালটু কথা নিকে গেচিস হতভাগা আচমকা মরতে গেলি কেন, সে কতাটা কি কোতাও নিকে রেকেচিস?…

দুই

বদলী করে দিয়েছে, নতুন অফিসের কর্মভার গ্রহণের তারিখ নির্দেশ ক'রে দিয়েছে, দেয়নি শুধু বাসার আশ্বাস !

বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাব সীমান্তের একটি মফঃস্বল শহরে, যেখানে অন্ততঃ তিনশো মাইলের মধ্যে কোনও আত্মীয়ের ছায়া মাত্র নেই, সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ে যথাসময়ে কাজে যোগ দেবার অসুবিধেটা কতদূর সেকথা বোঝবার দায় সবকারেব নয়।

চাকরি নেবার সময় বণ্ডে সই করনি তুমি, যে-কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত ? মনে নেই সেকথা ?

সরকার কি বণ্ডে সই কবেছিল, যখন যে দেশে পাঠাবে তোমাকে, তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে রাখবে ? তুমি তো তুমি নেহাৎ চুনোপুঁটি না হও চিংড়ি-চিতলের চাইতে বেশীও নও। বলে কত রুই-কাতলাই বদলী হয়ে পরের বাসায় নাক গুঁজে থেকে দিন কাটাচ্ছে, কাপড়ের তাঁবুতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে !

তবু তো তুমি প্রভাত গোস্বামী, ঝাড়া হাত-পা মানুষ। না স্ত্রী, না পুত্র, না ডোয়ো, না ঢাকনা। একটা স্যুটকেস, একটা বেডিং, একটা জলের কুঁজো, একটা টিফিন কেরিয়ার, সর্বসাকুল্যে এইতো তোমার সম্পত্তি। এতেই ভাবনায় অস্থির ?

তা সত্যি বলতে প্রভাত একটু বেশীই ভাবছে। তার কারণ এ যাবৎ নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার অবস্থা ওর কখনো ঘটেনি। হাওড়ায় দেশের বাড়ীতে বাড়ীর ছোটছেলের প্রাপ্য পাওনা পুরোদস্তুর ভোগ করেছে, চাকরির প্রথম কালটা কাটিয়ে এসেছে লক্ষ্ণৌতে কাকার বাড়ী। কাকাই চাকরির জোগাড়দার। তিনি কী অফিসে, কী বাসাতে সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছিলেন ভাইপোর সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে। কিন্তু বিধি হলো বাদী।

বদলীর অর্ডার এলো।

প্রভাতের মা অবশ্য খবরটা শুনে ভেবে ঠিক করে ফেললেন, এ নিশ্চয় ছোট বৌয়ের কারসাজি, বরকে বলে-কয়ে ভাসুরপোর বদলীর অর্ডার বার করিয়ে দিয়েছে, কারণ—

কারণ আর নতুন কি, বলাই বাহুল্য। পর নিয়ে ঘর করায় অনিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।

খুড়ি বরং চেষ্টা করছিলেন, সামনে পূজোর ছুটিতে নিজের বিয়ের যুগ্যি বোনঝিটিকে নিজের কাছে আনিয়ে নেবেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে দিদির কাছে ঘটকী বিদায় আদায় করবেন।

কিন্তু হলো না। জগতের বহুবিধ সাধু ইচ্ছের মত সে ইচ্ছেটা আপাততঃ মুলতুবি রাখতে বাধ্য হতে হলো তাঁকে। বদলিটা পূজো পর্যন্তও ঠেকানো গেল না। পুজোর ছুটিতে চলে আসবার জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়ে কাকা-কাকী বিদায় দিলেন। প্রভাত সেই বিষণ্ণ আদ্রতার ছোঁয়ার সঙ্গে নিজের অসহায়তার ভয়াবহতা মিশিয়ে চিত্তকে বেশ ঘনতমসায় আবৃত করে গাড়ীতে উঠলো।

আর বেচারা হতভাগ্যের ভাগ্যে, সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল প্রবল বর্ষণ।

সারারাত্রি ঠায় জেগে কাটিয়ে দিলো প্রভাত, বন্ধ কামরার মধ্যে বৃষ্টির শব্দের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে করতে। গাড়ীতে আরও তিনজন আরোহী ছিলেন, তাঁদের প্রতি ঈর্ষা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রভাত নিশ্চিত হলো আর যাই হোক, ওরা কেউ বদলী হয়ে যাচ্ছে না।

তবে বৃষ্টির আওয়াজ একটু উপকার করলো প্রভাতের। তিন দিক থেকে তিনটি নাকের আওয়াজ তার কর্ণকুহরকে শিহরিত করতে ততটা পেরে উঠলো না।

কানের থেকে মনটাই তার কাছে প্রধান হয়ে রইলো।

স্টেশনে যখন নামলো প্রভাত, তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু শেলেট পাথরের মত আকাশের নীচে পৃথিবীটা যেন শোকগ্রস্তের মত জড়

পুঁটুলি হয়ে পড়ে আছে।

ভেবেছিল, কুলিও পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু আশঙ্কা অমূলক, কুলি যথারীতি গাড়ী থামবার আগেই গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাতের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার জিনিসপত্র টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেললো এবং কোথায় যাবেন ও গাড়ী হবে কিনা শুধিয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইলো।

আর ঠিক এই মুহূর্তে—এই ভয়াবহ সঙ্গীন মুহূর্তে ঘটে গেল এক অদ্ভুত অঘটন।

সেই অঘটনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রভাতকে স্বীকার করতেই হলো কলিতে ভগবান নেই, এটা ভুল সিদ্ধান্ত। ভগবান আছেন, এবং আর্তের আবেদন তাঁর কানে এক আধ ক্ষেত্রেও অন্ততঃ পৌঁছোয়।

আর পৌঁছোলে আর্তত্রাণকল্পে দূতও পাঠান তিনি।

সেই দূত হিসাবে এসে দাঁড়ালেন একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক, ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটি রীতিমত রূপসী তরুণী।

খুব সম্ভব পিতা কন্যা।

প্রভাতের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক দরাজগলায় বলে উঠলেন, 'কোথায় উঠবেন?'

প্রভাত প্রথমটা থতমত খেলো। এমন পরিচিত ভঙ্গীতে যিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি পূর্বপরিচিত কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, তারপর সচকিত হলো পরিচিত নয়। কিন্তু একটি রূপসী তরুণীর সামনে বুদ্ধু ব'লে চুপ করে থাকার লজ্জা বহন করা চলে না। তাই মৃদু হেসে বললে, 'ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকেই ওই প্রশ্ন করছিলাম।'

'বুঝেছি!' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ভদ্রলোক কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে বলেন, 'বলিনি তোকে? মুখ দেখেই বুঝেছি বাসার ব্যবস্থা হয়নি। নতুন বদলী হয়ে এলেন বোধহয়? ওপরওলাদের আক্কেল দেখছেন তো? বদলী করেই খালাস। সে ওঠে কোথায়, খায় কি, তার দায়িত্ব নেই। পাঁচ বছর ধরে শুনছি মশাই, গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার্স তৈরি হবে। তা সে শোনাই সার। ছেলে-

বেলায় শুনতাম আঠারো মাসে বছর, এখন দেখছি ছাব্বিশ মাসে—'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে ফাঁক পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে ফাঁকটা একরকম করে নিয়ে বলে ওঠে প্রভাত, 'তা আপনি তো এখানকার সব জানেন শোনেন। বলুন দিকি, সুবিধেমত কোনও মেস বা হোটেল পাওয়া যেতে—

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তবে নাহোক আপনাকে দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? মল্লিকা, শোন্! কথা শোন্ ভদ্রলোকের! আমার নিজের আস্তানা থাকতে আমি সন্ধান দিতে যাবো কোথায় মেস আছে, কোথায় হোটেল আছে! চলুন চলুন, এই গরীবের গরীব খানায় গিয়ে উঠুন তো। তারপর বুঝবেন থাকতে পারবেন কি না পারবেন!'

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বলে, 'না না সে কি, আপনার বাড়ীতে গিয়ে উৎপাত করবো কেন, আপনি শুধু যদি—'

'আহা-হা, উৎপাত কি! এ তো আমার ভাগ্য! আপনাদের মত অতিথি পাওয়া পরম ভাগ্য! আজ ভালো লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম মল্লিকা, কি বলিস? চলুন চলুন, এই যে গরীবের একখানা হাঁটুভাঙা পুষ্পরথও আছে।'

অদূরে অবস্থিত একটা টাঙার দিকে চোখ পড়ে প্রভাতের। ভদ্রলোক কুলিটাকে ইসারা করেন এবং মুহূর্তে সে কর্তব্য পালন করে। আর প্রভাত এক নজরে দেখে এইটুকু অবশ্য অনুভবই করে, গাড়ীর ব্যাপারে ভদ্রলোক অতিবিনয়ী নয়। গাড়ীটা হাঁটুভাঙাই বটে।

সেই গাড়ীতেই যখন ভদ্রলোক প্রভাতকে উঠিয়ে দিয়ে সকন্যা নিজে উঠে পড়েন, তখন প্রভাত সভয়ে না বলে পারে না, 'ভেঙে যাবে না তো?'

আশপাশ সচকিত করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। হাসির দাপটে দুলে দুলে বলেন, 'সে ভয় নেই, দেখতে যেমনই হোক ভেতরে মজবুত।'

'কিন্তু আপনি ওদিকে কেন?' প্রভাত তারস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আপনি এদিকে আসুন। আমিই কোচ্‌ম্যানের পাশে—'

কিন্তু ততক্ষণে বিশ্রী ঝাঁকুনি নিয়ে গাড়ী চলতে সুরু করেছে।

ভদ্রলোক ওদিক থেকে বলেন, 'না মশাই, আমার আবার উল্টোদিকে ছুটলে মাথা ঘোরে।'

অতএব পরিস্থিতিটা হলো এই, টাঙার পিছনের সিটে প্রভাত আর মল্লিকা। প্রতিমুহূর্তে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগাতে লাগাতে উল্টোমুখো ছুটতে লাগলো তারাই দুজনে।

যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত হয়েও প্রভাত সেই দুরূহ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলো না, আর মনে মনে বলতে বলতে গেল, মাথা ঘোরাবার ব্যবস্থাটা তাহলে আমার জন্যেই বহাল হলো!

এও ভাবলো, ভদ্রলোক বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে আত্মীয়-সমাজের বাইরে থাকেন বলেই এমন মুক্তচিত্ত।

যাই হোক, আপাতত যে 'প্রবাসে বাঙালী' লাভ হলো, এ বহু-জন্মের ভাগ্য। অন্ততঃ আজকের মত মালপত্র রেখে অফিসটা তো দর্শন করে আসা যাবে। তারপর কালই একটা কোনো ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সরকারী অফিস যখন আছে, মেস বোর্ডিং কোথাও না কোথাও জুটে যাবেই!

আবার ভাবলো, এ যুগেও এরকম অতিথিবৎসল লোক থাকে!

ভদ্রলোক যদি একা হতেন, হয়তো প্রভাত কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হতো, হয়তো ভাবতো এতইবা আগ্রহ কেন? মতলব খারাপ নয় তো? কোনো গুণ্ডার আড্ডায় তুলে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি কেড়ে নেবে না তো!

কিন্তু সকল সন্দেহ মূক করে দিয়েছে মল্লিকার উপস্থিতি। বুঝে ফেলেছে, আর কিছুই নয়, বাঙালীহীন দেশে বাঙালী-পাগলা লোক!

কিন্তু মেয়েটা একটাও কথা কয়নি কেন? বোবা না কি? বাপ তো বারবার ডেকে ডেকে সালিশ মানছেন। যার জন্যে নামটা জানা হয়ে গেছে। বোবাকে কি কেউ ডেকে কথা কয়?

প্রভাত একবার চেষ্টা করে দেখবে না কি? আচ্ছা কী কথা বলা চলে? এখানের আবহাওয়া? কতদিন এদেশে আছেন? না কি

আপনাদের বাসা আর কতদূরে ?

আলাপ জমাতে গেলে ভদ্রলোক বিরক্ত হবেন ? নাঃ, তা নিশ্চয়ই নয়। মেয়েকে যখন এভাবে বসতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজামুখো ছুটছেন, তখন মাথার পিছনে কান খাড়া করে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

ত্রিভঙ্গঠামে হলেও টাঙাটা ছুটছিল ভালোই।

দু'পাশে নীচু জমি, সেখানে সবুজের সমারোহ, মাঝখানে সরু আলরাস্তা চড়াই উৎরাইয়ের বৈচিত্র্যে লোভনীয়।

ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁকুনি !

তা সেটা অস্বস্তিকর হলেও তেমন বিরক্তিকর তো ঠেকছে না। অনেকক্ষণ চলার পর, প্রভাত যখন অনুমান করছে লোকালয়ের বাইরে চলে এসেছে, তখন দূরে থেকে কয়েকটা ছোট ছোট কটেজ দেখা গেল। ওদেরই একটা নিশ্চয়ই ! প্রভাত এবার মনের জোর সংগ্রহ করে ধাঁ করে বলে ফেললো, 'আর বেশীদূর আছে নাকি ?'

মল্লিকা চমকালো না।

বরং মনে হলো যেন একটা কোনো প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই হচ্ছিল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, 'ওই তো দেখা যাচ্ছে।'

কথা বাড়াবার জন্যেই বলে প্রভাত, 'ওদের মধ্যে কোনটা ?'

'সবগুলোই।'

'সবগুলো !'

'হ্যাঁ, তাও তো কুলিয়ে উঠছে না, আরও বাড়ী তৈরীর কথা হচ্ছে।'

বিস্ময়বোধ না করে পারে না প্রভাত।

পরিবার বড় হলে বড় বাড়ী তৈরী করে লোকে, আলাদা আলাদা কটেজ, এটা কি রকম। তবু বলে, 'খুব বড় জয়েণ্ট ফ্যামিলি বুঝি ?

হঠাৎ মল্লিকা অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে। ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে 'সামনে-ছোটা' ভদ্রলোককে একবার দেখে নেয়, তারপর বলে, 'এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি ? কী ছেলেমানুষ আপনি ?'

কী বুঝতে পারবে প্রভাত !

ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কোনদিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মল্লিকাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করছে। তাই ওই কটেজগুলোর মধ্যেই বোধগম্য কিছু আছে কিনা দেখবার জন্যে অনবরত ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

বেশীক্ষণ অবশ্য সন্দেহদোলায় দুলতে হলো না। টাঙাটা ঝড়াং করে থেমে গেল। এবং ভদ্রলোক নেমে পড়ে বললেন, 'এই যে এসে গেছি। সাবধানে নামুন প্রভাতবাবু।'

প্রভাতবাবু!

নাম জানাজানিটা কখন হলো? প্রভাত সবিস্ময়ে বলে, 'আমার নামটা জানলেন কি করে?

'কি করে?' একটু হেসে বললেন, 'হাত দেখে। সুটকেসের ওপর টিকিট এঁটে রেখে নিজেই ভুলে যাচ্ছেন মশাই? আসুন, এই গরীবের গরীবখানা। এই সামনের ছোটখানি নিয়ে সুরু করে ছিলাম। আমাদের পাঁচজনের কল্যাণে আশেপাশে আস্তে আস্তে—সাবধানে! পাথরটার ওপর পা দিয়ে আসুন। সারারাত বৃষ্টি পড়ে কাদা—মল্লিকা, তুই গণেশকে পাঠিয়ে দিগে যা। জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নিক। প্রভাতবাবু সাবধান, শুধু এই পাতা পাথরের ওপর দিয়ে—'

সাবধানে পা টিপে টিপে এসে প্রথম কটেজটার সামনে দাঁড়ায় প্রভাত, আর সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে।

'আরাম কুঞ্জ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মডারেট চার্জে আহার ও বাসস্থান। প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি!'

কী বোঝা উচিত ছিল, এতক্ষণে বুঝতে পারে প্রভাত। জলের মত পরিষ্কার।

লোকালয়ের বাইরে বহুবিস্তৃত জমি নিয়ে চ্যাটার্জির 'আরাম কুঞ্জ।'

ঘরের পেছনে বারান্দা। সরু একফালি, তবু তাতেই দুখানি বেতের চেয়ার, একটি ছোট টেবিল।

চায়ের ট্রেটা চাকরই দিয়ে যায়, তবে তত্ত্বাবধানে আসে মল্লিকাই! হেসে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'এতক্ষণে বুঝেছেন

বোধ হয় ?

নতুন বাড়ি, ছবির মত সাজানো ঘর, পিছনের এই বারান্দা থেকে যতদূর চোখ পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের সীমায় আকাশের কোলে পাহাড়ের নীলরেখা। মেঘমেদুর আকাশের বিষণ্নতা কেটে আলোর আভাস উঁকি দিচ্ছে। সৌন্দর্য মোহগ্রস্ত প্রভাত এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেইদিকে, চা এবং মল্লিকা, দু'টোর চাঞ্চল্যে চোখ ফিরিয়ে হেসে বলে, 'একটু একটু।'

'আপনি একটু বেশী সরল।'

'তার চাইতে বলুন না কেন, একটু বেশী নির্বোধ।'

'বলাটা ভদ্রতা নয়, এই যা'

'কিন্তু কি করে জানব বলুন ? ভাবলাম প্রবাসে বাঙালী—

মল্লিকা হেসে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, ঠোঁটে রঙের প্রলেপ বলেই কি দাঁতগুলো অত সাদা দেখাচ্ছে ? কিন্তু তাতে সাদাই দেখাবে, অমন মুক্তোর মত নিখুঁত গঠনভঙ্গী হবে ?

'জায়গাটা বড় সুন্দর !'

'হ্যাঁ।' মল্লিকা ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলে, 'নামটা যখন 'আরাম কুঞ্জ' ! কিন্তু হাসির সঙ্গে মুখটা এমন কঠিন হয়ে ওঠে কেন ওর ?

'বাস্তবিক সার্থকনামা। কিন্তু আমাকে ত এখুনি বেরোতে হবে। আমার অফিসটা কতদূরে, উত্তরে কি দক্ষিণে, পূর্বে কি পশ্চিমে কিছুই জানি না। এখানের ব্যবস্থাটাই বা কি রকম হবে—মানে আপনার বাবাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবেনও না !' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ওই একবার যা স্টেশনে দর্শনের সৌভাগ্য। আবার গেছেন লোক ধরতে—কিন্তু উনি আমার বাবা নয়, মামা'

প্রভাত যেন একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক তাহলে স্রেফ হোটেলের আড়কাঠি। আর এই সুসজ্জিতা সুবেশা রূপসী তরুণী তার মেয়ে না হলেও ভাগ্নী।

তবে আসল মালিক বোধ হয় এর বাবা।

শালাকে লাগিয়ে রেখেছেন লোক ধরে আনতে! কিন্তু সারাক্ষণ লোক কোথায়? ট্রেন তো আর বারবার আসে না।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ওসব অনেক সিক্রেট! বুঝবেন না।'

'তা না হয় বুঝলাম না। কিন্তু এখানে থাকার ব্যবস্থা কি, চার্জ কি রকম, এখান থেকে অফিস যাওয়া সম্ভব কিনা, তা তো বুঝতে হবে।'

'আমার কাছে সবই জানতে পারেন।'

'আপনিই কর্ণধার?'

মল্লিকা হঠাৎ চোখ তুলে কেমন যেন একরকম করে তাকালো। তারপর বললো, 'দেখাশোনা করি। চা টা খান। এখুনি তো বেরোবেন বলছেন। ভাত—'

'না না, ওসব কিছু না। এই এতবড় ব্রেকফাষ্ট করে আবার ভাত! চার্জটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।'

মল্লিকা হেসে ওঠে। 'আচ্ছা ভীতু লোক তো আপনি! মারাত্মক কিছু একটা নয়! চলুন দেখাই গে খাতাপত্তর।'

চার্জ? না এমন কিছু মারাত্মক সত্যিই নয়।

ব্যবস্থার তুলনায় তো নয়ই।

ব্যবস্থা যে এত উত্তম হতে পারে, এটা প্রভাতের ধারণার মধ্যে ছিল না। 'আরাম কুঞ্জের'র শুধু যে নিজস্ব একটা টাঙ্গা আছে তাই নয়, একখানা জীপও আছে। এবং সেই জীপখানা বোর্ডারদের জন্যে সর্বদা খাটে, নিয়ে যায় শহরের মধ্যস্থলে, অফিস পাড়ায়, কর্মকেন্দ্রে।

'নইলে আপনারা গরীবের আস্তানায় থাকবেন কেন? এখানে খোলা বাতাসটাও পেলেন, আবার কাজকর্মেরও অসুবিধে হলো না—'

প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি বলেন, 'আপনার আশীর্বাদে যিনি একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তিনি বারে বারে পায়ের ধুলো দেন।'

হ্যাঁ, চ্যাটার্জির দর্শন আর একবার মিলেছে।

কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানবার জন্যে এসেছেন। বারে-

বারে প্রশ্ন করেছেন।

প্রভাত হেসে বলে, 'অসুবিধে কি মশাই, বরং সুবিধেটাই এত বেশী হয়ে যাচ্ছে, যে ভয় হচ্ছে, এরপর আর কোথাও—'

'এরপর আর কোথাও মানে—' হাঁ হাঁ করে ওঠেন চ্যাটার্জি, 'আবার কোথায় যাবেন? নিজের ঘরবাড়ীর মতন থাকবেন। ওই-জন্যেই টানা লম্বা ঘরদালান না করে ছোট ছোট কটেজ করা।'

প্রভাত কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এত লোক আসে?'

'বলেন কি মশাই?'

হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, 'দেখতে নিরীহ হলে কি হবে জায়গাটা কতবড় বিজনেস ঘাঁটি? অবিশ্যি একদিক থেকে বলেছেন ঠিকই, বাঙ্গালী কমই আসেন। মানে, বিজনেসের ব্যাপারে তো বুঝতেই পারছেন?'

'কতদিন আছেন আপনি এখানে?'

'ওঃ, সে কি আজ? রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম 'ধুত্তোর বাংলা দেশ! তারপর কোথা দিয়ে যে কি হলো? এখানেই—'

'দেশে আর কখনো যাননি?'

চ্যাটার্জি একবার তীব্র কটাক্ষে প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। নিছক সরল কৌতুহল, না আর কিছু?

নাঃ, সরল বলেই মনে হচ্ছে।

বোকা প্যাটার্নের ছেলেটা!

বলেন, 'গিয়েছিলাম! একবার বাপ মরতে গিয়েছিলাম, আর একবার বিধবা বোনটা মরতে বাচ্চা ভাগ্নিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছি, ব্যস! সেই অবধি।'

প্রভাত হাসে, 'কিন্তু এমন নিখুঁত বাঙালী রয়ে গেছেন কী করে বলুন তো? এতদিন বাইরে থাকলে লোকে তো—'

'বলেন কি মশাই, বাঙালীর ছেলে, বাঙালী থাকবো না? যাক্,

তাহলে অসুবিধে কিছু নেই ?'

'না না, মোটেই না। আপনার বোর্ডিংয়েব নামকরণ সার্থক !'

চ্যাটার্জি একটু মিষ্টি-মধুর হাসেন, 'হাঁ সকলেই অনুগ্রহ করে ওকথা বলে থাকেন। ক্রমশই বুঝবেন, কেন নিজের এত গৌরব করলো চ্যাটার্জি। এ তল্লাটে 'আরাম কুঞ্জ' বললে চিনবেনা এমন লোক নেই। আর ওই যা বললাম, একবার যিনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন—'

প্রভাত সসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু আমাকে যে এখানে স্থায়ী ভাবে থাকতে হবে। মানে যতদিন না ফের বদলি হচ্ছি।'

'কি আশ্চর্য! থাকবেন তার চিন্তার কি আছে?' চ্যাটার্জি মুচকি হাসেন, 'দেখবেন, এখান থেকে আর বদলি হতেই চাইবেন না। তবে শুনুন—' চ্যাটার্জি চুপি চুপি বলেন, 'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম! ব্যবসা করেছি বলে তো আক্কেলের মাথা খেয়ে বসিনি মশাই। বিবেচনাটা আছে। দেখবেন ক্রমশঃ চ্যাটার্জির বিবেচনার ত্রুটি পাবেন না।'

'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম—' এই আশ্বাস বাণীটি হৃদয়ে মধুবর্ষণ করতে থাকে। হৃষ্টচিত্তে প্যাড্ টেনে নিয়ে চিঠি লখতে বসে প্রভাত।

মাকে লেখে, কাকাকে লেখে।

মাকে লেখে—'মা তোমাদের কাছ থেকে আরও অনেক দূরে চলে এসেছি। আসবার সময় মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অজানা জায়গা—কোথায় থাকবো, কি করবো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে স্টেশন থেকেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটি বাঙালীর হোটেল পেয়েছি, বাঙালী রান্নাও খেলাম। ঘর নতুন, সুন্দর সাজানো, বাড়ীটি ছবির মতন, আর জায়গাটা এত চমৎকার যে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সকলকেই দেখাই। ঘরের পিছনের বারান্দায় বসলে যতদূর চোখ চলে, যাকে বলে মুক্ত প্রান্তর, আর তার ওপারে পাহাড়। পরে আবার চিঠি দেবো। প্রভাত।'

কাকাকে লিখলো, 'কাকা, তোমাদের কাছ থেকে এসে মন কেমন করছে, একথা লিখতে গেলে ছেলেমানুষী, তাই আর লিখলাম না। থাকার খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরে আবার চিঠি দিচ্ছি। তুমি ও কাকীমা আমার প্রণাম জেনো। আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকো। কাকীমাকে বলো, জায়গাটা খুব সুন্দর। ইতি—

প্রভাত।'

দু'জনকেই জানাতে উদ্যত হচ্ছিল, মল্লিকার মত একটি মেয়েকে এরকম জায়গায় দেখতে পাওয়ার বিস্ময় বোধটা, কিন্তু কিছুতেই ভাষাটা ঠিকমত মনে এলো না। ভাবলো, যাকগে, কী আর এমন একটা খবর।

ভাবলো কিন্তু সেই 'কী আর এমনা'ট মনের মধ্যে একটা খবরের মত কানাকানি করতে থাকলো!

সত্যি, আশ্চর্য! এ ধরনের বাঙালী পরিবার পরিচালিত হোটেল, এখানে দেখতে পাওয়া অভাবনীয়। পুরীতে কাশীতে রাঁচিতে এখানে সেখানে দেখেছে প্রভাত, যতটুকু যা বেড়িয়েছে। অথচ ঠিক এ রকমটি কিন্তু দেখেনি। পাঞ্জাবের এই দূর সীমান্তে, শহর ছাড়ানো নির্জনতায়!

কিন্তু রাত্রে যেন নির্জনতাটা তেমন নির্জন রইলো না।

সারাদিনের ক্লান্তি আর গত রাত্রের ট্রেনের রাত্রি জাগরণ দুটো মিলিয়ে প্রভাতকে তাড়াতাড়ি বিছানা নেবার প্রেরণা দিচ্ছিল, তাই গণেশকে ডেকে প্রশ্ন করলো এখন খেতে পাওয়া যাবে কিনা।

গণেশ মৃদু হেসে জানালো, এখানে পাওয়া যাবে কিনা বলে কোনও কথা নেই। রাত দুটো তিনটেতেও লোক আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

প্রভাত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'অতরাত্রে লোক? তখনও কোনো ট্রেন আসে নাকি?

গণেশ আর একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'ট্রেন আসে কিনা জানি না বাবু। লোক আসে তাই জানি। তেমন হলে, আমাদের তো আর রাতে ঘুমোবার জো থাকে না। শীতের রাতে হী হী করতে করতে—'

'ওরে বাবা। এখানের শীত!' প্রভাত পুনঃ প্রশ্ন করে, 'তুমি তো বাঙালী?'

'তা হবে!'

তা হবে!

কৌতুক অনুভব করে প্রভাত গণেশের কথায়। বলে, 'তা হবে মানে? নিজে কোন্ দেশের লোক জানো না?'

'জানার কি দরকার বাবু! ভূতের আবার জন্মদিন! আপনার খাবার আনছি।'

প্রভাত ভাবলো খাবার কি গণেশই আনবে? অন্তত তার সঙ্গে আর কেউ আসবে না?

নাঃ এলোও না। গণেশ এলো। তার সঙ্গে একজন অবাঙ্গালী বয়।

পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে, পরিষ্কার ন্যাপ্‌কিন। আহার্যের সুবাসে যেন ক্ষিদে বেড়ে ওঠে প্রভাতের।

কাকার বাড়ীর নিত্য ডাল রুটির ব্যবস্থার পরই এই রাজকীয় আয়োজনটা দেখে প্রভাতকে একটু ঔদারক মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

তবু খেতে খেতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো প্রভাত, ইচ্ছে করে একটু দেরী করে খেতে লাগলো। যদি তদ্বিরকারিণী একবার এসে উদয় হয়।

না। প্রভাতের আশা সফল হলো না!

অদৃশ্য একটা কর্মজগতের উপর কেমন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা অনুভব করলো প্রভাত। এত কাজ! বাবাঃ!

বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম আসবার কথা, কিন্তু কিছুতেই যেন সে ঘুমটা আসছে না। উঁকি দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।

কত রকমের শব্দ।

কত জুতোর শব্দ, কত কথার শব্দ, কত গ্লাস প্লেট পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দ......কত লোক আসে এখানে? আর আসে কি রাত্রেই বেশী? কেন?

অচেনা পরিবেশে রাত্রির এই মুখরতায় একটু যেন ভয় ভয় করলো প্রভাতের, গা-টা সির্ সির্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে দেখলো, ছিটকিনি লাগিয়েছে কিনা। তারপর ঘড়ি দেখলো। মাত্র এগারোটা। তখন লজ্জা করলো প্রভাতের।

নিজে সন্ধ্যা আটটায় শুয়ে পড়েছে বলেই মনে করছে কি না জানি গভীর রাত। এই সময় লোকজন বেশী হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পাখী সারাদিন আকাশে ওড়ে কিন্তু সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে।

এইসব বিজনেস-ম্যানেরা সারাদিন অর্থের ধান্ধায় কোথায় খায়, কোথায় থাকে, কিন্তু রাত্রে আস্তানায় ফেরে, খায়-দায় আড্ডা জমায়। মদই কি আর না খায়? ভাবলো প্রভাত।

আমাদের বিবেচনাশীল প্রোপ্রাইটার মশাই অবশ্যই সে ব্যবস্থা রেখেছেন। আবার ভয় এলো। কেউ মাতাল-টাতাল হয়ে গোলমাল করবে না তো! মাতালে বড় ভয় প্রভাতের!

কিন্তু না। শব্দ ক্রমশঃ কমে এলো, ঘুমিয়ে পড়লো প্রভাত।

পরদিন চায়ের টেবিলে মল্লিকার আবির্ভাব। গত কালকের মত প্রসাধনমণ্ডিত নয়। একটু যেন ঢিলেঢালা। সদ্য স্নান করেছে, খোলা ভিজে চুল।

প্রভাতের মনে হলো এ আরও অনেক মনোরম।

কাল ভেবেছিল রূপসী। আজ ভাবলো সুন্দরী।

কাল মনে করেছিল মনোহর। আজ মনে করলো মনোরম।

বয়সের ধর্ম, প্রভাত একটু অভিমান দেখালো। 'কাল তো আর আপনার দর্শনই মিললো না।'

মল্লিকা দুটো চেয়ারের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। মধুর হাসি হেসে বললো, 'দেবীদর্শন এত সুলভ নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। আর আজও প্রত্যাশার পাত্র উপুড় করে রেখেছিলাম।'

'উঃ কী কাব্যিক কথা! চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

'চোখ ঠাণ্ডা হলে, চা চুলোয় গেলেও ক্ষতি হয় না।'

মল্লিকার মুখটা সহসা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। চাঁচাছোলা টানটান মুখটায় এই সামান্য পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে।

সেই কঠিন মুখে বলে মল্লিকা, 'কমবয়েসী মেয়ে দেখলেই কি এরকম কাব্যি জেগে ওঠে আপনার?'

মুহূর্তে অবশ্য প্রভাতের মুখও গম্ভীর হয়ে যায়। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে বলে, 'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।'

'রাগ হয়ে গেল?'

'রাগ নয়, চৈতন্য!'

'অত চৈতন্যদেব না হলেও ক্ষতি নেই। আমি শুধু একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কারণ কি জানেন? আমি আপনাকে সাধারণ পুরুষদের থেকে আলাদা ভেবেছিলাম।'

প্রভাত এবার চোখ তুলে তাকায়। একটি বদ্ধ গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'হয়ত আপনার ধারণা ভুল ছিল না। এটা ব্যতিক্রম কিংবা হয়তো আমি নিজেই নিজেকে জানতাম না। কোনও অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপের সুযোগও ত আসেনি কখনো।'

'ওঃ বুঝেছি!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'একেবারে গৃহপোষ্য। তাই সোনা কি রাঙ চিনতে শেখেননি এখনো।'

'তার মানে?'

'মানে নেই। খান, খেয়ে ফেলুন।'

'কিন্তু দেখুন সকালে এত খাওয়া। এখুনি তো আবার অফিস যেতে হবে ভাত খেয়ে—'

'না তো!' মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে বলে, 'তাই অভ্যাস নাকি আপনার? কাল যে বললেন—ইয়ে আমরা তো আপনার লাঞ্চটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে জিপে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

'বলেন কি! এ যে ধারণার অতীত!'

'কেন?'

'বাঃ বাড়ীতেও তো এমন ব্যবস্থা সব সময় হয়ে ওঠে না।'

মল্লিকা হঠাৎ একটা দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'বাড়ীতে বউ নেই বোধহয়? বুড়ো মা-পিসিকে দিয়ে আর কত—'

প্রভাতের মুখে একটা পরিহাসের কথা আসছিল। মুখে আসছিল—'বৌ তো কোনখানেই নেই।' কিন্তু মল্লিকার ক্ষণপূর্বের কাঠিন্য মনে করে বললো না।

শুধু বললো, 'নাঃ আপনাদের ব্যবস্থা সত্যি ভালো।'

'শুনে খুশী হলাম। কিন্তু উত্তরটা পাইনি।'

'উত্তর? কিসের উত্তর?'

'ঘরে বৌ আছে কিনা?'

'জেনে আপনার লাভ?'

'লাভ? আপনি বুঝি প্রতিটি কথাও খরচ করেন লাভ লোকসানের হিসেব কষে?'

'তা পৃথিবীর নিয়ম তো তাই।'

'হুঁ। পৃথিবীর নিয়মটা খুব শিখে ফেলেছেন দেখছি। কাল তো সন্ধ্যাবেলাই শয্যাশ্রয় করলেন। নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল?'

প্রভাত হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সেই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। আজ আর মেঘলা নেই। সকালের নির্মল আলোয় ঝকঝক করছে। মল্লিকার প্রশ্নে সচকিত হয়ে বলে, 'ঘুম? সত্যি বলতে প্রথমে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এত রকম শব্দ?'

'শব্দ? কিসের শব্দ?'

একটু যেন উত্তেজিত দেখায় মল্লিকাকে। প্রভাত বিস্ময় বোধ করে হেসে ওঠে, 'ভয় পাবার কিছু নেই, বাঘের গর্জনের শব্দ নয়। মানুষের পায়ের, বাসনপত্রের, টুকরো কথার—'

'আর কিছু নয়?' মল্লিকার দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, মেয়েটার তো মুহূর্তে মুহূর্তে খুব ভাব পরিবর্তন হয়। কিন্তু কেন হয়? মুখে বলে, 'না তো। আর কি হবে?'

মল্লিকা নরম হয়ে যায়। সহজ হয়ে যায়। বলে, 'তাই তো। আর কি হবে। তবে বাঘের গর্জনও অসম্ভব নয়।'

'অসবম্ভব নয়! বাঘ আছে!' প্রভাত প্রায় ধ্বসে পড়ে।

আর মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ভয় পাবেন না পাহাড়ের ওদিকে বাঘ ডাকে। তবে বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর তিন তিনটে কুকুর রাত্রে পাহারা দেয় এখানে। চেন খুলে রাখা হয়। বাঘও ভয় পায় তাদের?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আস্তে বলে প্রভাত, 'সন্ধ্যেবেলা আপনি খুব খাটেন, তাই না?'

'শুধু সন্ধ্যেবেলা? সর্বদাই! অহোরাত্র।'

কেমন একটা ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে মল্লিকা।

প্রভাত বলে, 'এত কী কাজ? লোকজন তো রয়েছে।'

'লোকজনকে দিয়ে কি সব হয়? অতিথির আদর অভ্যর্থনা নিজেরা না করলে চলে?'

শুনে সহসা প্রভাতের সংস্কারগ্রস্ত গৃহস্থমন বিরূপ হয়ে ওঠে আর অধিকার অনধিকারে প্রশ্ন ভুলে বলে ফেলে সে, 'এটা আপনার আপত্তি করা উচিত।'

মল্লিকা নিরীহ ভাবে বলে, 'কোন্‌টা অন্যায়? কিসে আপত্তি করা উচিত?'

'এই, যে আসে তার আদর অভ্যর্থনার দায়িত্ব আপনার নেওয়া। কতরকমের লোক আসে, আর এইসব অঞ্চলের নানা জাতের ব্যবসায়ীরা যে কী ধরণের লোক হয়, জানেন না তো?'

মল্লিকা আরও নিরীহ ভাবে বলে, 'আপনি জানেন?'

'এর আর জানাজানির কি আছে?' প্রভাত সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'কে না জানে! না না, আপনি ওসব দিকে যাবেন না।'

'বাঃ, মামার ব্যবসার দিকটা তো দেখতে হবে।'

'দেখতে হবে!' প্রভাত চটে উঠে বলে, 'মামার ব্যবসাটাই বড় হলো? নিজের মান-সম্মানটা কিছু নয়?'

'কে বললে মানসম্মানের হানি হয়?' আবার উত্তেজিত হয় মল্লিকা।

'হয় না? আপনি বলছেন কি?' প্রভাত উত্তেজিত ভাবে বলে, এমন কিছু কম বয়স আপনার নয় যে, জগতের কিছু বোঝেন না। এ

থেকে আপনার ক্ষতি হতে পারে, এ আশঙ্কা নেই আপনার ?'

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে যায়। বিষণ্ণভাবে বলে, 'আশঙ্কা থাকলেই বা কি! আমার জীবন তো এইভাবেই কাটবে।'

প্রভাত এই বিষণ্ণ কথার ছোঁয়ায় একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলে 'বাঃ তাই বা কাটবে কেন? মেয়েদের জীবনে তো মস্ত একটা সুবিধে আছে। বিয়ে হলেই তারা একটা নতুন পরিবেশে চলে যেতে পারে।'

'হু', সুবিধেটা মস্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিয়ে না হলে ?'

'বিয়ে না হলে !' প্রভাত দুর্বলভাবে বলে, 'না হবে কেন ?'

'সেটাই স্বাভাবিক।' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'মা-বাপ মরা মেয়ে, মামার কি দায় !'

প্রভাত বোধ করি আবার ভুলে যায় সে কে, কী তার অধিকার তাই রীতিমত চটে উঠে বলে, 'দায় অবশ্যই আছে। এদিকে তো বাঙালীয়ানায় খুব বড়াই করলেন আপনার মামা, বাঙালী সংসারে বাপ-মরা ভাগ্নীর বিয়ে দেবার দায় থাকে না? তা থাকবে কেন, আপনাকে দিয়ে দিব্যি সুবিধে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—'

মল্লিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'খুব তো বড় বড় কথা বলছেন, আপনি আমার বিষয়ে কতটুকু জানেন? জানেন, মামা আমাকে দিয়ে কি কি সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন ?'

'বেশী জানবার কিছু নেই। নিজের চক্ষেই তো দেখলাম, খাতা লিখছেন হিসেব পত্তর দেখছেন, বোর্ডারদের সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য দেখছেন, নিজে মুখেই তো বললেন, অহোরাত্র খাটছেন। এই যথেষ্ট, আর বেশী না জানলেও চলবে। আমি বলবো আপনার মামার এটা রীতিমত স্বার্থপরতা। আর আপনার উচিত এর প্রতিবাদ করা।'

'সত্যি।' হঠাৎ বেদম খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লিকা। আর নেহাত বাচাল মেয়ের মত বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে আমার ওপর আপনার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। লক্ষণ ভালো নয় !'

'উপহাস করছেন ?' আহত কণ্ঠে বলে প্রভাত।

'কে বললে ?' মল্লিকা হাসি থামিয়ে বলে, 'খাঁটি সত্য কথা।

কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি, মামা এরকম স্বার্থপর না হলে আপনিই বা আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন কোথায়? আপনার সঙ্গেও তো সেই একই সম্পর্ক মামার বোর্ডার।'

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আরক্ত মুখে বলে, 'মাপ করবেন নিজের পোজিশনটা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আরাম কুঞ্জে'র ডানপাশের রাস্তায় জীপ গাড়িটা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রভাত অফিসের সাজে সজ্জিত হয়ে এসে দেখলো ভিতরে আরও দু'জন ইতিমধ্যেই আসীন।

গতকাল একাই গিয়েছিল, এবং আজও সেইরকম ধারণা নিয়েই আসছিল, সহযাত্রী যুগলকে দেখে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

তা প্রভাত কি কুনো? মানুষ ভালোবাসে না সে?

ঠিক তাও নয়। সত্যি কথা বললে বলতে হয়, প্রভাত একটু প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট। সহযাত্রীরা বাঙালী হলে সে যে পরিমাণ প্রসন্ন হয়ে উঠতো, সেই পরিমাণ অপ্রসন্ন হলো ওদের দেখে।

বিদেশী পদ্ধতিতে একটু সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ করে প্রভাত গম্ভীর মুখে উঠে বসলো। দেখল পায়ের কাছে তিনটে টিফিন কেরিয়ার বসানো এবং তাদের হাতলে এক একটা সুতো বেঁধে অধিকারীর নামের টিকিট লটকানো।

মিঃ গোস্বামী, মিঃ ট্যাণ্ডন, মিঃ নায়ার। প্রভাত ভাবলো সর্বধর্ম সমন্বয়। ভাবলো চ্যাটার্জি লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার বটে!

গাড়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো, তিনটি যাত্রী কেউ কারো সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলো না। শুধু প্রভাতের মনে হলো অন্য দু'জন যেন অনবরত তার দিকেই লক্ষ্য করছে।

মনের ভ্রম? না কি সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার?

প্রভাতও তো বারবারই ওদেরই দেখেছে।

আজও সন্ধ্যায় গণেশ ও সেই অপর একজন খাবার নিয়ে এলো।

এবং যথারীতি মল্লিকার দেখা মিললো না।

সকাল থেকে অকারণেই প্রভাতের মনটা বিষ হয়েছিল। সকালের সেই লোকদুটো এ বেলাও সহযাত্রী হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। জীপের ব্যবস্থা দেখে কাল খুশি হয়েছিল, আজ বিরক্তি বোধ করছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে এদিক ওদিক দু'চারখানা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে, জগতের সকলেরই প্রভূত টাকা আছে। নেই শুধু প্রভাতের।

নিজের একখানি 'কার' চালিয়ে যথেচ্ছ বেড়াতে পাওয়াটাই প্রভাতের মতে আপাততঃ জগতের শ্রেষ্ঠ সুখের অন্যতম মনে হতে লাগলো। জিপের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হবে, অথচ কেমন যেন দয়া দয়া ভাব। নিজেকেও 'দয়ার ভিখিরী' মত লাগছে।

গণেশকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়ীতে আর যে দু'জন ভদ্রলোক ছিল ওরা এখানে বরাবর থাকে?'

গণেশ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'কি জানি।'

'কি জানি মানে? তুমি জানো না?'

'আজ্ঞে না বাবু, আমাদের কিছু জানবার আইন নেই।'

'ব্যাপার কি বলো তো? এখানে কিছু রহস্য টহস্য আছে না কি?' প্রভাত উত্তেজিত ভাবে বলে, 'তোমাদের মালিক যখন স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন, তখন যে রকম ভেবেছিলাম, সেরকম তো দেখছি না।'

গণেশ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশী ভাবাভাবির দরকার কি বাবু? আছেন থাকুন। কোনও অসুবিধে হয় জানাবেন, ঢুকে গেল।'

'গাড়ীতে যারা গেল, তাদের আমার ভালো লাগেনি!'

'তা বিশ্বসুদ্ধু লোককে ভালো লাগবে তার কি মানে আছে?' গণেশ ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে বলে, 'রেলগাড়ীতে কত লোক পাশে বসে যায়, সবাইকে আপনার ভালো লাগে? আপনি বাঙালী আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, নিজের তালে থাকুন সুখে থাকবেন।

অন্যদিকে নজর দিতে গেলে বিপদ আছে।'

গণেশ চলে যায়।

প্রভাতের মনে হয়, লোকটা নেহাৎ সামান্য চাকর নয়। কথাবার্তা বড্ড বেশী ওস্তাদমার্কা।

আজও দেরী করে করে খেলো প্রভাত, আর হঠাৎ মনে করলো এখানে থাকবো না। চ্যাটার্জির আরামকুঞ্জ ছাড়া সত্যিই কি আর জায়গা জুটবে না? অফিস অঞ্চলে চেষ্টা করে দেখবো।

পিছনের বারান্দার দিকটা অন্ধকার, তার নীচেই সেই সুবিস্তীর্ণ জমি, জানালাগুলোয় শিক নেই, শুধু কাঁচের শার্শি সম্বল।

নাঃ। চলেই যাবে। অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না।

খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসলো,—'শ্রীচরণেষু কাকিমা, আশা-করি কাকাকে লেখা আমার পৌঁছানো সংবাদ পেয়েছেন। লিখে-ছিলাম বটে থাকার জায়গা খুব ভালো পেয়েছি, কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে, অফিস অনেক দূর। রোজ যাতায়াতের পক্ষে বিরাট ঝামেলা। তাই ভাবছি, অফিস অঞ্চলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো। নতুন ঠিকানা হলেই জানাবো। ইতি।

আজও ভাবলো কাকিমাকে মল্লিকার কথাটা লিখলে হতো।

কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবলো কথাটাই বা কী, 'এখানে একটি মেয়ে আছে, নাম মল্লিকা,' তার পর?

এটা কি একটা কথা? অথচ কথাটা মন থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

চিঠিখানা কাল পাছে পোস্ট করতে ভুলে যায়, তাই অফিসের কোটের পকেটে রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল প্রভাত, দরজায় দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জি।

পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। প্রভাতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে নীচু হয়ে বললো 'এই দেখতে এলাম আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।'

প্রভাত ভুরুটা একটু কুঁচকে বললো, 'কই, আমাকে তো ডাকেননি মিষ্টার চ্যাটার্জি!'

'আহা-হা, ডাকবো কেন, ডাকবো কেন? তন্ময় হয়ে চিঠি লিখছিলেন। স্ত্রীকে বোধহয়।'

চ্যাটার্জির গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ঝলসে ওঠে।

প্রভাতের গতকাল এই বিনয় নম্র লোকটাকেই ঈশ্বর প্রেরিত মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ ওর ওই অতি বিনীত ভাবটাতে গা জ্বলে গেল। তাছাড়া মনে পড়লো, মল্লিকার মামা। তাই ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'স্ত্রী ছাড়া জগতে আর কাউকে কেউ চিঠি লেখে না?'

'আহা লিখবে না কেন?' আর একটু ধূর্ত হাসি হাসেন চ্যাটার্জি, 'লেখে পোস্টকার্ডে, দু'পাঁচ লাইন। আর এত তন্ময় হয়েও লেখে না! আমরা তো মশাই এটাই সার বুঝি।'

'আপনারা যা বোঝেন, হয়তো সেটাই সব নয়। চিঠি আমার কাকিমাকে লিখেছি।' বলে কথায় উপসংহারে সুর টেনে দেয় প্রভাত।

কিন্তু চ্যাটার্জি উপসংহারের এই ইঙ্গিত গায়ে মাখেন না। একটা অভব্য কৌতুকের হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে ওঠেন, 'কা—কি-মা-কে! আপনি যে তাজ্জব করলেন মশাই! কাকিমাকে—চিঠি, তাও এত ইয়ে। তা কী লিখলেন?'

প্রভাত আর শুধু ভুরু কুঁচকেই ক্ষান্ত হয় না, প্রায় ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'প্রশ্নটা কি খুব ভদ্রতা সঙ্গত হলো মিষ্টার চ্যাটার্জি?'

'আহা-হা, চটছেন কেন? এমনি একটা কথার কথা বললাম। বারোমাস যত নন্‌বেঙ্গলী নিয়ে কারবার, দুটো খোলামেলা কথা তো কইতে পারি না। আপনি বাঙালী বলেই—যাক্, যদি রাগ করেন তো মাপ চাইছি।'

এবার প্রভাতের লজ্জার পালা।

ছি ছি, বড় অসভ্যতা হয়ে গেল। হয়তো লোকটা ভাগ্নীর কাছে গিয়ে গল্প করবে। কী মনে করবে মল্লিকা তা কে জানে।

আসলে লোকটা মুখ্যু। তাই ভাব ভঙ্গিতে কেমন অমার্জিত ভাব। নেহাৎ পদবীটা চ্যাটার্জি তাই। নইলে নেহাৎ নীচু ঘরের মনে হতো।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'না না, রাগের কথা নয়। লক্ষ্ণৌতে কাকা-কাকিমার কাছেই ছিলাম এতদিন, এসে চিঠিপত্র না দিলে ভালো দেখায়? তা লিখছিলাম কাকিমাকে চিঠি, বললেন স্ত্রীকে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল! মাথা নেই। তার মাথাব্যাথা!'

'তাই নাকি? হা-হা-হা! ভাবী মজার কথা বলেন তো আপনি!' চ্যাটার্জি হেসে ঘর ফাটান।

চ্যাটার্জি চলে গেল, প্রভাত ভাবতে থাকে, অকারণ বিরূপ হচ্ছি কেন? না না, এটা ঠিক নয়। সন্দেহের কিছু নেই। রহস্যই বা কি থাকবে! লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার, এই পর্যন্ত। জিপের সহযাত্রিরা বাঙালী নয়, এতে বিরক্তির কি আছে? অফিসে তো সে ছাড়া আর কোন বাঙালী নেই! যাচ্ছে না প্রভাত সেখানে?

গণেশটার কথাবার্তাই একটু বেশী কায়দার। যেন ইচ্ছে করে রহস্য সৃষ্টি করতে চায়। ওর সঙ্গে আর কথা বলার দরকার নেই। আর—

আর মল্লিকার সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। কী দরকার প্রভাতের, কার মামা তার ভাগ্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করছে তার হিসেব নিতে যাওয়া।

সিদ্ধান্ত করলে—খাবে, ঘুমোবে, কাজে যাবে, ব্যস।

মনটা ভালো করে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো প্রভাত। ঘড়িতে দেখল রাত পৌনে দশটা।

কিন্তু প্রভাতের নিশ্চন্তার সুখ যে ঘণ্টাকয়েক পরেই এমন ভাবে ভেঙে যাবে, তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল? ঘণ্টা কয়েক।

ক'ঘণ্টা? পৌনে দশটার পর শুয়ে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে প্রভাত? ঘুমের মধ্যে সময় নির্ণয় হয় না, তবু প্রভাতের মনে হলো ঘণ্টা তিন চার পার হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানলার কাছে খুব দ্রুত আর জোরে একটা টকাটক শব্দে। পিছনের খোলা বারান্দার দিকের জানলা।

ভয়ে বুকটা ঠাণ্ডা মেরে গেলে প্রভাতের, ঝপ করে বেড্ সুইচটা টিপে আলোটা জ্বেলে ফেলে কম্পিত বক্ষে সেই দিকে তাকালো।

কে ও? চোর ডাকাত? খুনে গুণ্ডা?

জানলা ভেঙে ফেলবে? অশরীরি যে একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা তাহলে ভুল নয়। না কি সেই বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোরই কোন একটা কাঁচ আঁচড়াচ্ছে।

কিন্তু তাই কি?

এ তো নির্ভুল মানুষের আওয়াজ। যেন সাঙ্কেতিক।

কাঁচ ভেদ করে গলার শব্দ আসে না, তাই বোধহয় ওই শব্দটাই অবলম্বন করেছে।

শব্দ মুহুর্মুহু বাড়ছে। টকটক! টকাটক খটখট!

কেউ কোন বিপদে পড়েনি তো!

দেখবে না কি। না দেখলেও তো বিপদ আসতে পারে। ঈষৎ ইতস্তত: করে প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরাতে গিয়েই চমকে উঠলো।

কী সর্বনাশ এ যে মল্লিকা! কোনো বিপদে পড়েছে তাহলে!

মল্লিকা এতক্ষণে ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে, আর প্রভাত বোকার মত বিছানায় শুয়ে কাঁপছে? কী বিপদ! কুকুরে তাড়া করেনি তো!

কী ভাবে যে জানলার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছিল প্রভাত তা আর মনে নেই। শুধু দেখতে পায় জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঝুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে জানলাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে আর পর্দাটা টেনে দিয়ে প্রভাতের বিছানার ধারে বসে হাঁফাচ্ছে।

প্রভাত চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ। এর মানে কী!

হাঁফানো থামলে মল্লিকা কাতর বচনে বলে, 'মিষ্টার গোস্বামী, আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিন।'

প্রভাত প্রায় অচেতনের মত এই অভূতপূর্ব ঘটনার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাত দু'টোর সময় তার বিছানায় উপর একটি বেপথু

সুন্দরী তরুণী। এ স্বপ্ন? না মায়া?

কথা কইলে বুঝি এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ মায়া মুছে যাবে।

ভেঙে গেল স্বপ্ন, মুছে গেল মায়া। প্রবল একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার মত চমকে উঠলো প্রভাত। কী বলছে বেপরোয়া মেয়েটা!......

'দয়া করে আলোটা নিভোন!'

প্রভাত প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী বলছেন আপনি?'

'মিষ্টার গোস্বামী, কী বলছি, তার বিচার পরে করবেন, যদি আমাকে বাঁচাতে চান—'

হঠাৎ নিজেই হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মল্লিকা। বিছানার উপর ভেঙে পড়ে চাপা কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর সেই অন্ধকার ঘরের মাঝখানে প্রভাত বাক্‌শক্তিহীন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কতক্ষণ?

কে জানে কতক্ষণ!

হয়ত বা কত যুগ!

যুগ যুগান্তর পরে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়, অন্ধকারেও অনুভব করতে পারে প্রভাত, মল্লিকা উঠে বসেছে।

কান্নাভেজা গলায় আস্তে কথা বলে মল্লিকা, 'মিষ্টার গোস্বামী, আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন।'

ভূতের মুখে বাক্য ফোটে।

'আপনাকে কি নিজেকে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ধারণা করতে পারবেন না মিষ্টার গোস্বামী, কী অবস্থায় আমি এভাবে আপনাকে উত্যক্ত করতে এসেছি!'

অবস্থাটা যদি এত ভয়াবহ না হতো শুধু স্নায়ু নয়, অস্থিমজ্জা পর্যন্ত এমন করে সিটিয়ে না উঠতো, তাহলে হয়তো প্রভাত সহানুভূতিতে গলে পড়তো, কী ব্যাপার ঘটেছে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতো। কিন্তু অবস্থাটা ভয়াবহ।

তাই প্রভাতের কণ্ঠ থেকে যে স্বর বার হয়, তা শুকনো, আবেগশূন্য।

'সত্যিই ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু দয়া করে আলোটা জ্বালতে দিন, অবস্থাটা অসহ্য লাগছে।'

'না না না!' মল্লিকা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'চলে যাবো, ভোর হলেই চলে যাবো আমি। শুধু ঘণ্টা কয়েকের জন্যে আশ্রয় দিয়ে বাঁচান আমাকে।'

'কিন্তু মল্লিকা দেবী, আপনার এই বাঁচা মরার ব্যাপারটা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি।'

'পারবেন না! সে বোঝবার ক্ষমতা আপনাদের পুরুষদের থাকে না। তবু কল্পনা করুন, বাঘে তাড়া করেছে আপনাকে।'

'বাঘে!'

অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হয় প্রভাতের মুখ থেকে। ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার আগেই পিছনের সেই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত প্রসারিত অন্ধকার তৃণভূমির দৃশ্যটা মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার, আর অস্ফুট ওই প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়।

অন্ধকারে অসহনীয় ধাক্কাটা বুঝি ক্রমশঃ সহনীয় হয়ে আসছে, ভেন্টিলেটার দিয়ে আসা দূরবর্তী কোন আলোর আভাস ঘরের চেহারাটা পরিস্ফুট করে তুলছে। হাসির শব্দটা, লক্ষ্য করে অনুমান করতে পারছে প্রভাত, মল্লিকার মুখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখা। সেই রেখার কিনারা থেকে উচ্চারিত হলো, 'হ্যাঁ বাঘই! শুধু চেহারাটা মানুষের মত।'

স্তব্ধতা! দীর্ঘস্থায়ী একটা স্তব্ধতা!

তারপর একটা নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'এরকম পরিবেশে এইরকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে পারেন, এত রাত্রে আপনি নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

আবার মিনিটখানেক নিস্তব্ধতা, তারপর মল্লিকার ক্লান্ত করুণ স্বর ধ্বনিত হয়, 'এই আমার ললাটলিপি মিষ্টার গোস্বামী! চাকর-বাকর শুয়ে পড়ে, আমাকে তদারক করে বেড়াতে হয়, আগামী ভোরের রসদ মজুত আছে কিনা দেখতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে পড়লো,

স্টোরে সকলের ব্রেকফাস্টের উপযুক্ত ডিম নেই। তাই মুরগীর ঘর তল্লাস করতে গিয়েছিলাম। মিষ্টার গোস্বামী, কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হলো আপনার ঘরটাই নিরাপদ আশ্রয়।'

'অদ্ভুত মনে হওয়া! মল্লিকা দেবী আমিও একজন পুরুষ, এটা বোধকরি আপনি হিসেবের মধ্যে আনেন নি।'

'এনেছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির করেছিলাম, আপনি মানুষ।'

'আপনার এমন বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু এটা কেন ভাবছেন না, হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে আপনি আমার ঘরে, এবং আলো নিভানো ঘরে, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? আমার কথা থাক, আপনার দুর্নাম সুনামের কথাই ভাবুন।'

'ভাবছি! বুঝতে পারছি,' মল্লিকা আরও ক্লান্ত গলায় বলে, 'কিন্তু তবু সে তো মিথ্যা দুর্নাম। সত্যিকার বিপদ নয়। বাঘের কামড় নয়।'

অন্ধকারেই জিনিসপত্র বাঁচিয়ে বারকয়েক পায়চারি করে প্রভাত তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'কিন্তু সেই বদলোকটা যে কে, আপনার চেনা দরকার ছিল। আপনার মামাকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'মামাকে! আমার মামাকে! মল্লিকা আর একবারও কান্নায় ভেঙে পড়ে, আমার মামাকে আপনি চেনেন না, তাই বলছেন! মামা তাঁর খদ্দেরকে খুশি করতে নিজেই আমাকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিতে চান—'

'মল্লিকা দেবী!'

তীব্র একটা আর্তনাদ ঘরের স্তব্ধতাকে খান খান করে ফেলে!

না! সে অর্তনাদের শব্দ কারও কানে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করেনি। মোটা কাপড়ের পর্দা ঘেরা কাঁচের জানালা ভেদ করে কারো নিশ্চিন্ত ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়নি।

এখন সকাল।

এখন প্রভাত এসে দাঁড়িয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যের সামনে। গত দু'দিন শুধু সামনেই তাকিয়ে দেখেছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আজ

ছ'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখতে থাকে। ডানদিকে নীচু জমিতে ওই চালাঘরটা তাহলে মুরগীর ঘর। ওর জালতির দরজাটা সন্দেহের নিরসন করছে।

রাত ছটোর সময় ওইখানে নেমেছিল মল্লিকা ডিমের সন্ধানে? মল্লিকা কি পাগল? কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ও কি একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল?

কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব?

চিরদিন সাধারণ ঘর-গেরস্থার মধ্যে মানুষ নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রভাতের ওই সন্দেহটাকে 'সম্ভব' বলে মনে করতে বাধে।

তবে চ্যাটার্জির যে রূপ উদ্ঘাটিত করলো মল্লিকা, সেটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবে, এত অবোধ সরলও নয় প্রভাত। জগতের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ না দেখুক, জানে বৈকি।

স্বার্থের প্রয়োজনে স্ত্রী কন্যা বোনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়, জগতে এমন পুরুষের অভাব নেই একথা প্রভাত জানে না এমন নয়। এইদণ্ডে এই পিশাচ লোকটার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

কিন্তু!

কিন্তু কী এক অমোঘ অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল সে! তাই ভাবছে, মল্লিকাকে সে কথা দিয়েছে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। এই নরক থেকে, এই হিংস্র জানোয়ারের গুহা থেকে।

অথচ জানে না কেমন করে রাখবে সেই প্রতিজ্ঞা।

কাল নিরীক্ষণ করে দেখার দরকার হয়নি, আজ দেখছে। দেখছে সমস্ত সীমানাটা কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘেরা, সেই ব্যাঘ্রসদৃশ কুকুরগুলো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রে তাদের গর্জন মাঝে মাঝেই কানে এসেছে।

রাতে যাওয়া হয় না। তাছাড়া যানবাহন কোথায়? সেই চ্যাটার্জির জিপ্‌গাড়ীই তো মাত্র ভরসা। এক যদি মল্লিকা শহরের দিকে যাবার কোনও ছুতো আবিষ্কার করতে পারে।

কিন্তু মল্লিকা বলেছে, 'অসম্ভব'।

'কিন্তু তুমি তো মামার সঙ্গে রোজ স্টেশনে যাও লোক ধরতে!' বলেছিল প্রভাত।

'হ্যাঁ, মামার সঙ্গে।' মল্লিকা মৃদু তীক্ষ্ণ একটু হেসেছিল।

তবু তাকে আশ্বাস দিয়েছে প্রভাত।

প্রভাত নয়, প্রভাতের শিরায় শিবায় প্রবাহিত পুরুষের রক্ত। যে রক্ত পুরুষানুক্রমে মধ্যবিত্ত জীবনের দায়ে স্তিমিত হয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি।

আশ্বাস দিয়েছে সেই রক্ত। আশ্বাস দিয়েছে তার যৌবন।

চায়ের সময় হয়ে গেছে। প্রভাত এখনো নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়নি। আকাশে আলো ফুটতে ফুটতেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন ফের ঘরে এলো। সাবান তোয়ালে টুথব্রাশ নিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলো বিছানাটার দিকে।

রাত দুটোর পর আর শোয়া হয়নি প্রভাতের। শোবার সময় হয়নি, হয়তো বা সাহসও হয়নি। এখন তাকিয়ে দেখছে কোথায় বসেছিল সেই ক্রন্দনবতী। কোনখানটায় আছড়ে পড়ে চোখের জলে সিক্ত করে তুলেছিল।

সত্যিই কি এসেছিল কেউ? না কি প্রভাতের স্বপ্নকল্পনা? চমকে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো। বালিশের গায়ে একগাছি লম্বা চুল!

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! এখুনি চাকরবাকর বিছানা ঝাড়তে আসবে। এ দৃশ্য যদি তাদের চোখে পড়তো! চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখলো আর কোথাও আছে কি না।

নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু, সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছাপিয়ে মল্লিকার একটা কথা মাথার মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে।

সে কাঁটা বলছে—একথা কেন বললো মল্লিকা?

কথাটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণ করলো প্রভাত। নতুন করে আশ্চর্য হলো।

'প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কী সত্যি পুরুষ!' তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত একটু হেসেছিল মল্লিকা এই প্রশ্নের সঙ্গে।

কোন্ কথার পিঠে এ প্রশ্ন উঠেছিল তা মনে পড়ছে না প্রভাতের। বোধকরি প্রভাতের প্রতিজ্ঞামন্ত্র পাঠের পর। না কি তাও নয়।

না তা নয়। বোধহয় চলে যাবার আগে। হ্যাঁ তাই। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কি সত্যি পুরুষ!'

এ কিসের ইঙ্গিত!

মল্লিকার করুণ অভিব্যক্তি আর ভয়াবহ ভাগ্যের পরিচয়ের সঙ্গে ওই হাসি আর প্রশ্নের সামঞ্জস্য কোথায়?

যথারীতি গণেশ এলো।

প্রভাত বিনা প্রশ্নে চায়ের ট্রেটা কাছে টেনে নিলো। কিন্তু তবু চোখে না পড়ে পারলো না, কেমন একরকম তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে গণেশ।

কেন, ওরকম করে হাসছে কেন? ও কি ঘরে ঢুকেছিল?

দীর্ঘ বেণী থেকে খসে পড়া কোনও দীর্ঘ অলক আর কোথাও কি চোখে পড়েছে ওর?

কোন বাক্য বিনিময় হলো না অবশ্য। কিন্তু গণেশের ওই চোরা ব্যাঙ্গের চাউনিটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

আর একদণ্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কী হয়, ওই অফিস যাবার মুখেই যদি প্রভাত বিল মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে যায় 'ওবেলা আর আসবো না' বলে?

ভালোমন্দ যাই হোক হোটেল একটা জুটবে।

এরকম 'হিংস্র সুন্দরে' তার দরকার নেই।

এর অন্তরালে কোথাও যেন বিপদের চোরা গহ্বর, এর শিরায় শিরায় যেন ভয়াবহ রহস্যের জাল পাতা।

চ্যাটার্জি লোকটা নোংরা নীচ ইতর কুৎসিত !

চ্যাটার্জির খদ্দেররা সৎ নয়।

নির্ঘাৎ রাত্রে এখানে মাতলামি চলে, নোংরামি চলে, জুয়ার আড্ডা বসে। হয়তো বা কালোবাজারের হিসেব নিকেশ হয়, হয়তো খাদ্যে আর ওষুধে কী পরিমাণ ভেজাল দেওয়া সম্ভব, তারই পরিকল্পনা চলে।

চ্যাটার্জি এদের পালক, পোষক। কী কুক্ষণেই স্টেশনে চ্যাটার্জির কবলে পড়েছিল প্রভাত। একবার ভেবেচিন্তে দেখলো না, যার সঙ্গে যাচ্ছি সে লোকটা কেমন।

'কী নির্বোধ আমি !'

কিন্তু শুধু কি ওইটুকু নির্বুদ্ধিতা !

কী চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে কাল রাত্রে !

তুমি প্রভাত গোস্বামী, বিদেশে এসেছো চাকরি করতে। কী দরকার ছিল তোমার নারীরক্ষার নায়ক হতে যাবার ? কোন্ সাহসে তুমি একটা অসহায় বন্দিনী মেয়েকে ভরসা দিতে গেলে বন্ধন মোচনের ? যে মেয়ের রক্ষকই ভক্ষক।

জগতে এমন কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে পুরুষের স্বার্থের আর পুরুষের লোভের বলি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। যতদিন প্রকৃতির লীলা অব্যাহত থাকবে, ততদিনই এই নিষ্ঠুর লীলা অব্যাহত থাকবে।

প্রভাত ক'জনের দুরবস্থা দূর করতে পারবে ?

তবে কেন ওই মেয়েটাকে আশ্বাস দিতে গেল প্রভাত চরম নির্বোধের মত !

চলে যাবে। আজই। জিনিসপত্র নিয়ে।

তাকিয়ে দেখলো চারিদিক।

কীই বা। এই তো সুটকেস, বিছানা, আর আল্‌নায় ঝোলানো দু-একটা পোষাক। দু' মিনিটে টেনে গুছিয়ে ফেলা যায়। টিফিন তো জিপেই আছে।

মল্লিকা তো চোখের আড়ালে।

মল্লিকার সঙ্গে তো জীবনে আর চোখাচোখি হবে না।

আল্‌নার জামাটায় হাত দিতে গেল। আর মুহূর্তে অন্তরাত্মা 'ছি ছি' করে উঠল। প্রভাত না মানুষ? ভদ্ররক্ত গায়ে আছে না তার?

অফিসে গিয়ে মনে হলো, কাকিমার চিঠিটায় মল্লিকা সম্পর্কে দু' লাইন জুড়ে দিয়ে পোস্ট করবে।

পকেট থেকে বার করতে গেল, পেল না।

কী আশ্চর্য, গেল কোথায় চিঠিটা? নিশ্চিত মনে পড়ছে, কোটের পকেটে রেখেছিল।

কিছুতেই ভেবে পেল না, পড়ে যেতে পারে কি করে।

কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে তুলে নিয়েছে, গায়ে চড়িয়েছে, গাড়ীতে উঠেছে, গাড়ী থেকে নেমে অফিসে ঢুকেছে। এর মধ্যে কা হওয়া সম্ভব?

চিঠিটা তুচ্ছ, আবার লিখলেই লেখা যায়, হারানোটা বিস্ময়কর।

কিন্তু আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল প্রভাতের জন্য, তখনও জানে না প্রভাত। সে বিস্ময় স্তব্ধ করে দিল খাবারের কৌটো খোলার পর।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাকি 'চাপাটি' হয়ে উঠেছিল সঙ্কেত প্রেরণের মাধ্যম। ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাই কি মল্লিকা কাজে লাগালো?

রুটির গোছার নীচে সাদা একটা কাগজের মোড়ক।

টেনে তুললো। খুলে পড়লো।

স্তব্ধ হয়ে গেল।

'দয়া করে রাত্রে জানলাটা খুলে রাখবেন।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ছিঁড়ে ফেললো টুকরোটা। না না না। কিছুতেই না! এ কী কুৎসিত জালে জড়িয়ে পড়েছে সে!

মল্লিকা কী? ও কি সত্যি বিপন্ন, না মায়াবিনী?

ভদ্র মেয়ের এত দুঃসাহস হয়?

কিন্তু সেই কান্না? সে কী মায়াবিনীর কান্না?

রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলো, তবু বিচলিত হবে না সে। জানলা খুলে রাখবে না। কে বলতে পারে বিপদ কোন পথ দিয়ে আসে। তার কি মোহ আসছে ?

মায়ের মুখ স্মরণ করলো।

প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো মাকে।

লেখা চিঠিটা আজ আর কোটের পকেটে রাখলো না, নিজের অফিসের ব্যাগে রেখে দিল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে শুলো।

কিন্তু ঘুমের কি হলো আজ ?

কিছুতেই কেন শান্তির স্নিগ্ধতা আসছে না। কী এক অস্বস্তিতে উঠে বসতে ইচ্ছে করছে।

পাখার হাওয়াটা যেন ঘরের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিছানায় ছুঁচ ফুটছে। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। জানলাটা একবারের জন্যে খুলে দিয়ে এই উত্তপ্ত বাতাসটা বার করে দিলে ক্ষতি কি ?

মনস্থির করে উঠে বসলো।

জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত চিন্তা করে খুলে ফেললো ছিট্‌কিনিটা, ঠেলে দিলো কপাটটা।

হু হু করে স্নিগ্ধ বাতাস এসে ঢুকছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুম এসে যাচ্ছে যেন।

আশ্চর্য ! অন্য অন্য কটেজগুলোর জানলা সব খোলা। ওদের ভয় করে না ? চোর, ডাকাত, বন্য জন্তুর ?

প্রভাত ভাবলো ওরা সকলেই অবাঙালী।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বাক্সর মধ্যে ঘুমানোর কথা ভাবতেই পারে না ওরা।

প্রভাত কী ভীতু ? থাক খোলা, কা হয় দেখাই যাক না।

কিন্তু কী দেখতে চায় প্রভাত ?

দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে।

আর প্রভাতের মনে হলো, মল্লিকা কি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে অভ্যস্ত ?

'মল্লিকা দেবী, এ রকম অসম সাহসিকতা করছেন কেন ?'

'কী করবো ? কখন কথা বলবো আপনাকে ?'

আজও ভেঙে পড়ে মল্লিকা, 'দিনের বেলা চারিদিকে পাহারা। ওই গণেশটা হচ্ছে মামার চর। সহস্র চক্ষু ওর। শুধু এই রাত্তিরে তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে !'

'কিন্তু কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আশ্চর্য ! আশ্চর্য আপনি।' মল্লিকার তীক্ষ্ণকণ্ঠ ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'আপনি কী শুকদেব ?'

'মল্লিকা দেবী ! আপনার ওপর থেকে আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নেবেন না।'

মল্লিকা সংযত হয়। ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, 'কি জানেন, পুরুষের একটা রূপই দেখেছি, তাই সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভালোকথা, সভ্য সুশ্রী কথা, কবে শিখলাম বলুন ? সেই আট বছর বয়েস থেকে মামার হোটেলের চাকরাণীগিরি করছি। মামার হুকুমে তাঁর খদ্দেরদের আকর্ষণ করতে'—

'থাক ! শুনতে কষ্ট হচ্ছে ! আজ আপনার কী বক্তব্য সেটাই শুনি।'

মল্লিকা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

জানলা দিয়ে ছায়া ছায়া জ্যোৎস্না আসছে। ওকে মনে হচ্ছে বন্দিনী রাজকন্যা ! তবে—

আজ ওর গলা কান্নায় ভেজা নয়। ক্লান্ত বিষণ্ণ মধুর।

'মিষ্টার গোস্বামী, আজ আমি কিন্তু নিজের স্বার্থে আসিনি। এসেছি আপনাকে সাবধান করতে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করছি, রোজ আপনি কী এত লেখেন ?'

'লিখি ! লিখি মানে ? চিঠি লিখি !'

'কাকে ? কাকে এত চিঠি—'

প্রভাত নিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'কেন বলুন তো ? এ কী অদ্ভুত কৌতূহল আপনাদের ! আপনার মামাও কাল নানান জেরায়—আপনাদের

হোটেলের খাতায় এ নিয়মটাও তাহলে লিখে রাখা উচিত ছিল, এখানে থাকতে হলে বাড়ীতে চিঠি লেখা নিষেধ।'

'আপনি রাগ করছেন ? কিন্তু জানেন, মামার সন্দেহ হয়েছে আপনি পুলিশের লোক !'

'চমৎকার !'

'ওই তো ! গণেশ রোজ খবর দিচ্ছে আপনি লিখছেন। মামার ভাবনা, এগুলো আপনি রিপোর্ট লিখছেন। কারণ প্রথম দিন এসে নাকি নানা অনুসন্ধান করেছিলেন ?'

'আরও চমৎকার লাগছে !'

'রাগ করলেও, সাবধান হোন, এই অনুরোধ। মামার এখানে অনেক রকম ব্যাপারই তো চলে। বলতে গেলে বেআইনি কাজের ঘাঁটি !'

'হুঁ। সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছিল।'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি সরল হলেও নির্বোধ নন। কিন্তু জানিয়ে রাখি শুনুন, কিছুদিন আগে আপনারই মতো একটি বাঙালী ছেলে বোর্ডারের ছদ্মবেশে এসে বাসা নিয়েছিল টিকটিকিগিরি করতে ! সে আর ফিরে যায়নি।'

'মল্লিকা দেবী !'

মল্লিকা কিন্তু এ আর্তনাদে বিচলিত হয় না। তেমনি দার্শনিক ভঙ্গীতে বলে, 'হ্যাঁ, তাই। ওই জঙ্গলের দিকে অনুসন্ধান করলে হয়তো এখনো তার হাড়ের টুকরো পাওয়া যেতে পারে।'

বিচলিত প্রভাত সহসা আত্মস্থভাবে বলে, 'কিন্তু কি করে বুঝবো আপনিও আপনার মামার চর নন ?'

'কী করে বুঝবেন !' মৃঢ় শোনায় মল্লিকার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। বিশ্বাস কি ? যেখানে এত সতর্ক চক্ষু, সেখানে কী ভাবে আপনি রাত্রিবেলা একজন যুবকের ঘরে—'

হঠাৎ প্রায় শব্দ করে হেসে ওঠে মল্লিকা।

'সেটাই তো ছাড়পত্র মিষ্টার গোস্বামী ! ওরা সন্দেহ করেছে আর

অনুমান করেছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আর প্রেমে পড়ার একটামাত্র অর্থই ওরা জানে। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি এখান থেকে পালান। মামাকে বলবেন, অফিসের দূরত্বের জন্যেই—'

প্রভাত আর একবার চেয়ে দেখে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রাত্রির গভীরে আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। মল্লিকাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে।

ক্ষণপূর্বের কটুমন্তব্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো প্রভাত। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু গতকাল তো একথা হয়নি, আমি একা পালাবো ?'

'কাল আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এই নরকের মধ্যে আর শাসনের মধ্যে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই যা অসম্ভব—'

'কিন্তু যদি আমি সম্ভব করতে পারি ?'

'চেষ্টা করতে যাবেন না, মারা পড়বেন।'

'মল্লিকা ! যদি আমি খোলাখুলি তোমার মামার কাছে প্রস্তাব করি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মল্লিকা। বসে পড়ে বলে, 'আপনি ! আপনি কি পাগল ! এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবেন, তা জানেন ?'

'খুন !'

'তা না তো কি ! জানেন না, বুঝতে পারেন নি, আমিই মামার শিকার ধরবার সব চেয়ে দামী টোপ্ !'

'বেশ, তবে লুকোনো রাস্তাই ধরতে হবে। শুধু তুমি রাজী কিনা—'

'আমি রাজী কিনা—শুধু আমি রাজী কিনা !'

একটা প্রবল বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে সহসা কি একজোড়া হিম শীতল সাপ এসে আছড়ে পড়লো প্রভাতের উপর। আর প্রভাতকে বেষ্টন করে ধরলো দৃঢ় বন্ধনে।

কিন্তু নাগপাশের বিভীষিকা নিয়েও বন্ধন কেমন করে এমন

আবেশময় হয়ে উঠতে পারে ?

'মল্লিকা !'

'চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই' এ কথাটা সব ক্ষেত্রে সত্য হয় কিনা জানি না, কিন্তু প্রভাতের পক্ষে হলো।

ভালোমানুষ প্রভাত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থমনা প্রভাত, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে একটা অসাধ্যসাধনই করে বসলো।

কিন্তু এই অসাধ্যসাধন কি সত্যই প্রেমের আকর্ষণে ?

প্রভাত এমন করেই একটা হোটেলওয়ালি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল যে, ভয় ভাবনা ত্যাগ করে ফেললো ? মস্ত একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হলো না ?

মাত্র কয়েকটি দিনে এমন প্রেমের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ?

হয়তো তা নয়।

মল্লিকার রূপ যৌবন একটা মোহের সঞ্চার করলেও, প্রভাতের ভদ্রচিত্তের কাছে সেই আবেদনই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি।

মানবিকতার প্রশ্নটাও ছোট নয়।

মল্লিকার অশ্রুজলের আবেদন, একটি নিঃসহায়া নিরুপায় মেয়ের জীবনের অনিবার্য শোচনীয়তা, প্রভাতকে বিচলিত করে তুললো।

তাই হঠাৎ মোহে নয়, যা করলো জেনে বুঝেই করলো।

মল্লিকা যে নিষ্কলঙ্ক নয়, মামার শিকারের টোপ হবার জন্যে ওকে যে অনেক খোয়াতে হয়েছে, এ বুঝতে ভুল হয়নি প্রভাতের।

তবু সে মানবিকতার সঙ্গে যুক্তি আর বুদ্ধিকেও কাজে লাগিয়েছে। ভেবেছে যুগটা আধুনিক।

এ যুগে সভ্যজগতের নিয়ম নয়, মানুষকে মাছ দুধের মত 'নষ্ট হয়ে গেছে' বলে ফেলে দেওয়া।

ভেবেছে, এ যুগে তো বিধবা বিয়ে করছি আমরা। বিবাহ বিচ্ছেদের সমুদ্র পার হওয়া মেয়েকে বিয়ে করছি।

ভেবেছে, ও তো মানসিক পাপে পাপী নয় !

দুর্ভাগ্য যদি ওকে নিদারুণতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে থাকে, সে দোষ কি ওর? একটা মানুষকে যদি পঙ্কের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সুন্দর জীবনের বৃন্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে প্রভাত, সে কাজে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

তবু মিথ্যা কৌশল অনেক করতে হলো বৈকি। প্রভাতকে কলকাতা থেকে বন্ধু মারফৎ 'মায়ের মারাত্মক অসুখ' বলে টেলিগ্রাম আনিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হলো, আর মল্লিকাকে স্টেশনের ধারে টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে 'পায়ের হাড়' ভাঙতে হলো।

অসহ্য যন্ত্রণার অভিনয়ে অবশ্য মল্লিকাও কম পারদর্শিতা দেখায়নি। চ্যাটার্জি তাকে হিঁচড়ে টাঙায় তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জায়গাটা স্টেশন। অনেক লোকের ভিড়। তাদের পরামর্শের চাপে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ভাগ্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো চ্যাটার্জিকে, আর 'ডাক্তার নেই, চারটের সময় আসবেন। রেখে যান' —নার্সের এই হুকুমও মানতেই হলো।

তারপর?

উৎকোচের পথেও আসতে হয়েছে বৈকি। উৎকোচ আর ধরাধরি। এই দুই পথেই তো অসাধ্যসাধন হয়।

এই তো জগতের সব সেরা পথ।

ট্রেনে চড়ে বসার পর আর ভয় করে না।

চ্যাটার্জি কি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে ভাগ্নী খুঁজতে বেরোবে?

আর পুলিশ?

তার কাছে জবাব আছে। মল্লিকা নাবালিকা নয়।

আর ততদিনে—পুলিশ যতদিনে খুঁজে পাবে, হয়তো রেজিস্ট্রী করেই ফেলতে পারবে।

রেজিস্ট্রী? হ্যাঁ, ওটা চাই।

ওই তো রক্ষামন্ত্র। তারপর অনুষ্ঠানের বিয়েও হবে বৈকি! প্রভাত বলে, 'ওটা নইলে মন ওঠে না। সেই যে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—'

মল্লিকাও তার স্বপ্নসাধের কথা বলে, 'জানো, ছেলেবেলায় এক পিসতুতো দিদির বিয়ে দেখেছিলাম, সেই থেকে সেইরকম 'কনে' হবার যে কী সাধই চেপে বসেছিল মনে, খেলাঘরে 'বিয়ে বিয়ে' খেলতাম, কনে হয়ে ঘোমটা দিতাম, ঘোমটা খুলে অদৃশ্য অদেহী বরের দিকে চোখ তুলে তাকাতাম !'

'উঃ, ওইটুকু বয়সে কম পাকা তো ছিলে না ?' প্রভাত হেসে ওঠে।

চলন্ত ট্রেনের কামরা।

জানলা দিয়ে হুহু করে দুরন্ত বাতাস আসছে, মল্লিকা গল্প করছে তার ছেলেবয়সের দুরন্তপনার কথা।

কেমন করে গাছে চড়ে বসে থেকে মাকে নাজেহাল করতো। কেমন করে পারানির মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে নৌকোয় চড়ে গঙ্গার এপার ওপার হতো।

হ্যাঁ, গঙ্গার তীরেই গ্রাম।

যোগের স্নানে লোক আসতো এ গ্রাম ও-গ্রাম থেকে। মল্লিকা সেই ভীড়ে মিশে মেলাতলায় ঘুরতো।

'আবার মার সঙ্গে মার কাজও করেছি বৈকি। ওই অতটুকু বেলাতেই করেছি। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছি। ছোট্ট কাচা শাড়ী পরে চন্দন ঘসেছি, ফুল তুলে রেখেছি।···তারপর কোথা দিয়ে কী হলো, ফুলের বন থেকে গিয়ে পড়লাম পাঁকের গর্তে। স্বর্গ থেকে পড়লাম নরকে। ওর থেকে যে কোনোদিন উদ্ধার পাবো, সে আশা—'

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায় মল্লিকার। অশ্রু টলটল করে দুটি চোখে।

'আমার জীবন, যেন একটা গল্পের কাহিনী।'

মল্লিকা চেয়ে থাকে সুদূর আকাশের দিকে।

তা চ্যাটার্জির জীবনও একটা গল্পকথা বৈকি।

চাটুয্যে বামুনের ঘরের ছেলে, বাপ সামান্য কি চাকরি করে, আবার যজমানীও করে। ছেলে ছোট থেকে উচ্ছন্নের পথে। নীচ জাতের ঘরে পড়ে থাকে, তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, গাঁজা খায়। বাপ বকেঝকে

যজমানী কাজ করতে বললে হি হি করে হাসে, আর বলে, 'বাগদীর ঘরের ভাত খেয়ে আমার তো জাতজন্মের বালাই নেই। ছুঁলে তোমার শালগেরামের জাত যাবে না?'

কিন্তু ছেলেবেলার দুষ্টুমি বয়েস হতেই পরিণত হলো কেউটে বিষে। একবার বাগদীদের হাতে মার খেয়ে হাড় ভেঙে ঘরে পড়ে রইলো তিন মাস, তখন বাপের কাছে দিব্যি গাললো, কান মললো, নাকে খৎ দিলো, আর সেরে উঠে মানুষ হয়েই একদিন রাতের অন্ধকারে গেল নিরুদ্দেশ হয়ে।

আর সেই রাত্রে বাগদীদের সেই রঙ্গিণী বৌটাও হলো হাওয়া। যার জন্যে মার খেয়ে হাড় ভাঙা।

তারপর বহু বহুকাল পাত্তা নেই, অবশেষে একদিন বোনকে অর্থাৎ মল্লিকার মাকে, একটা চিঠি লিখে জানালো 'বেঁচে আছি, তবে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে, যাওয়া অসম্ভব। ঠিকানা দিলাম, বাবা মরলে একটা খবর দিস। যতই হোক বামুনের ছেলে, নেহাৎ শূয়োর গরুটা আর খাবো না সে সময়।' ছেলে চলে যেতে মেয়ে জামাইকে কাছে এনে রেখেছিল চাটুজ্যের বাপ।

তা বাপ মরতে দিয়েছিল চিঠি, বোন নয় ভগ্নিপতি।

আর সেই খবর পেয়েই চাটুজ্যে অতকাল পরে গ্রামে ফিরে এসে বাপের ভাঙা ভিটেটুকু আর দু'পাঁচ বিঘে যা ধানজমি ছিল, বেচে দিয়ে বোন-ভগ্নিপতিকে উচ্ছেদ করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করেছিল।

এসব কথা মল্লিকা তার মার মুখে শুনেছে। তখনও সে শিশু। তারপর তারও বাপ মরেছে। মা লোকের বাড়ী ধান ভেনে, বড়ি দিয়ে, কাজকর্মে রেঁধে, দিন গুজরাণ করে মেয়েটাকে মানুষ করে তুলছিল। তা সে মাও মরলো। আর কেমন করে না জানি খবর পেয়ে মামা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

কে জানতো যে সেই তখন থেকেই মতলব ভাঁজছিল চাটুজ্যে!

'তখন তো বুঝিনি—' মল্লিকা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'মামার মুখে মধু, ভিতরে বিষ! আমাকে কোলে জড়িয়ে বোনের নাম করে কত কাঁদল,

কত আক্ষেপ করল, আমায় এতদিন আদর যত্ন করেনি বলে হা হুতোশ করল। মুখের মধুর মোহে তখন খুব ভালোবেসে ফেললাম। মনে হলো, মামার নামে যা কিছু নিন্দে শুনেছি সব বাজে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে—' শিউরে ওঠে মল্লিকা। চুপ করে যায়।

প্রভাত ওর মুখের দিকে তাকায়। সরল পবিত্র মুখ।

সত্যি, মানুষ কি এতই সস্তা জিনিস যে, সামান্য খুঁৎ হলেই তাকে বর্জন করতে হবে?

দূর পথে পাড়ি। কত কথা কত গল্প!

সেই বাগ্‌দীদের বৌটা?

সেটা নাকি আর কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মামা বলতো, 'আপদ গেছে। হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে আমার!' এখন আর কোন কিছু নেশা নেই মামার, শুধু পয়সা আর পয়সা।

আচ্ছা, তা' তো হল, কিন্তু—এব মাঝখানে লেখাপড়া শিখলো কখন মল্লিকা? এমন কায়দাদুরস্ত হলো কি করে?

তা তার জন্যে মামার কাছে ঋণী বৈকি!

যে উদ্দেশ্যেই হোক' মেম রেখে ইংরিজি শিখিয়েছে মামা, শিখিয়েছে চালচলন।

না, উদ্দেশ্যটা মহৎ নয়। দুরস্ত করেছে যত অবাঙালী খদ্দেরদের জন্যে—তবু যে ভাবেই হোক মল্লিকা তো পেয়েছে কিছু!

বাংলা? সেটা সম্পূর্ণ নিজের আকুলতায় আর চেষ্টায়। পার্শেলে বই আনিয়ে আনিয়ে—

তাতে আপত্তি ছিল না মামার?

না! এদিকে যে আবার মল্লিকার তোয়াজ করতেন। বুঝতেন তো মল্লিকাই খদ্দেরদের অর্ধেক আকর্ষণ। স্টেশনে একা গেলে লোক আসতে চায় না, মল্লিকা গেলে ঠিক বঁড়শি গেলে।

তার সাক্ষী তো স্বয়ং আমিই—হেসে উঠেছিল প্রভাত।

হ্যাঁ, ওখানে সব আছে।

মদ, জুয়া, ভেজাল, কালোবাজার। তারাই তো দামী খদ্দের।

আর ওইজন্যেই তো পুলিশে অত ভয় চাটুয্যের। পুলিশের লোক বলে সন্দেহ হলেই—

'সব কথাই বলছি তোমায়, সব কথাই বলবো।' মল্লিকা বলে, 'প্রথম যেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, সেদিন ঠকিয়েছিলাম তোমায়। অভিনয় করেছিলাম।'

'অভিনয়!' আড়ষ্ট হয়ে তাকায় প্রভাত।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ, অভিনয় করতে করতেই তো বড় হয়েছি। মামার শিক্ষায় অভিনয় করেছি। আবার মামাকে ঠকাতেও করেছি! সেদিন গিয়েছিলাম মামার শিক্ষায় তোমার পকেট থেকে চিঠি চুরি করতে।'

'চিঠি চুরি!' পৃথিবীটা দুলে ওঠে প্রভাতের।

কিন্তু মল্লিকা অকম্পিত।

সে সব বলবে। তারপর প্রভাত তাকে দূর করে দিক, আর মুখ না দেখুক, তাও সইতে পারবে।

মরতে ইচ্ছে হতো মাঝে মাঝে কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়ী এই পৃথিবীর দিকে তাকালেই মনটা কেঁদে উঠতো। নিজের ওপর মায়ায় ভরে যেতো মন। আর কল্পনা করতো, কবে কোনদিন আসবে তার ত্রাণকর্তা।

আরও তিনজন আশ্বাস দিয়েছিল!

'প্রথমবার এক বাঙালী মহিলা।'

মহিলা!

হ্যাঁ, একজন নার্স। স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছিলেন! অনুভব করেছিলেন মল্লিকার দুঃসহ যন্ত্রণা। টের পেয়েছিলেন মল্লিকার জীবনের গ্লানি। বলেছিলেন, মল্লিকাকে নিয়ে যাবেন। তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ এনে দেবেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন মল্লিকাকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন।

'তারপর আপনারই মত দু'জন যুবক। সহানুভূতি দেখিয়েছেন, উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন বলেছেন, যাবার সময় ভুলে গেছেন।'

'তার মানে ওই আশা দিয়ে লোভ দেখিয়ে রেখে বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিয়েছে।' প্রভাত রাগ করে বলে।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'পৃথিবীতে দেবতা আর ক'জন জন্মায়?'

প্রভাত তার হাতের ওপর একটা হাত রাখে, ঈষৎ চাপ দেয়। তাবপব বলে, 'কিন্তু মনে আছে তো? তোমার পরিচয়টি কি? মনে রেখো তোমার মামা গরীব ব্রাহ্মণ, মামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় তোমাকে নিয়ে অকূল পাথ রে পড়েছেন। দূব প্রবাসে ছোট্ট একটি দোকান আছে, সেইটি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ভাগ্নীব জন্যে পাত্র খুঁজবেন, এমন অবস্থা নয়। দৈবক্রমে আমার সঙ্গে পবিচয়। আমি গোস্বামী শুনে, হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি—'

হেসে ওঠে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ভুলে যাবো না।'

না, ভুলে গেল না তারা।

ওই গল্প দিয়ে ভোলালো বাড়ীর লোককে, আত্মীয়বর্গকে।

কিন্তু সমাজ সংসাবী ঝুনো মানুষদের ভোলানো কি সোজা? না, সোজা নয়। তাই কাজটা খুব সহজ হয়নি। অনেক ভুরু কুঁচকে উঠেছিল।

প্রথম ভুরু কোঁচকালেন মা। প্রভাত-জননী করুণাময়ী।

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাংলা বিহার ছাড়া পাণ্ডববর্জিত দেশ সেই পাঞ্জাব বর্ডারে লোকটা যে একা পড়ে আছে, এর কারণ কি? কোনও দোষঘাট ছিল কিনা কে জানে? শুনে মনে হচ্ছে যেন সমাজ সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে বসে থাকা লোক। বলি তার জ্ঞাতি গোত্তর আত্মবন্ধু কাউকে দেখেছিস সেখানে?···দেখিসনি? তবে? বলি তাঁর জাতকুলের নিশ্চয়তাই বা কী? সে বলল, আমি বামুন, অমনি তুই মেনে নিলি বামুন। জাত ভাঁড়িয়ে অরক্ষণীয়া কন্যে পার করার কথাও আমরা শুনিনি এমন নয়। এরপর যদি প্রকাশ পায় তেলি তামলি কি হাড়ি ডোম—'

প্রভাত মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'দেখে কি হাড়িডোম বলে ভ্রম

হচ্ছে তে মার ?'

শুনে করুণাময়ী কিঞ্চিৎ থতমত খেয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আহা, সে কথা বলছি না। তবে সময় সময় গোবরেও পদ্মফুল ফোটে না তা নয়।'

'সে পদ্ম তুলে নিয়ে ঠাকুর পূজো কর না তোমরা ?'

'হ'ল কুতর্কের সুরু—' করুণাময়ী বলেন, 'ফুলের জাত আছে ?'

'নেই। আর মানুষেরও থাকা উচিত নয়। মানুষ হচ্ছে মানুষ এই তার পরিচয়। তার সত্যিকার পরিচয় তৈরি হয় তার আচার আচরণে রুচি প্রকৃতিতে—'

করুণাময়ী ঝঙ্কার দেন, 'এই ক'দিন বিদেশ ঘুরে এসে অনেক কথা শিখেছিস দেখছি। এ আর কিছু নয় তোর খুড়ির কুশিক্ষা। চিরদিন দেখেছি ছোটবৌ তোকে বেশী ভালবাসার ভান করে আমার বিপক্ষে উস্কেছে। আর এবার তো একেবারে বেওয়ারিশ হাতে পেয়েছিল।'

'আহা কী মুস্কিল! সে ভদ্রমহিলাকে আবার এর মধ্যে টানছ কেন? যার কথা হচ্ছিল তার কথাই হোক না। ওই মামা নামক ভদ্রলোকটির পদবী চ্যাটার্জি এতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকালের ব্যবসা বাণিজ্য সেখানে তাঁর। জীবনের প্রারম্ভে কি আর ভদ্রলোক ভবিষ্যৎ দর্শন করে রেখেছিলেন যে, সুদূর কালে তিনি ভাগ্নীদায়ে পড়বেন, আর এই আমা হেন গুণনিধি তাঁর কবলে গিয়ে পড়বে, তাই সেই আগে থেকে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে চাটুয্যের খাতায় নাম লিখিয়ে বসে থেকে ছিলেন ?'

'হয়েছে, অনেক কথা শিখেছিস। যাক তবুও হেস্তনেস্ত আমি দেখবো। ওই রিষড়ে না কোথায় যেন মায়ের বাপের দেশ বলছিস। সেখানে খোঁজ করাবো আমি। তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুলবো।'

প্রভাত চুপ করে ছিল।

চট করে মুখের ওপর বলতে পারে নি 'রিষড়েই হোক আর রাজস্থানই হোক, যতই তুমি তোলপাড় করে ফেলো মা, বিয়ে ওকে আমি করবোই। আমাকে করতে হবেই। আমি ওকে আশ্রয়

দিয়েছি, আশ্বাস দিয়েছি।'

ভেবেছিল দেখাই যাক না মায়ের দৌড়। কে যাবে অত খোঁজ খবর নিতে।

মল্লিকা তখন অবস্থান করছে প্রভাতের এক ছেলেবেলার বন্ধুর বোনের বাড়ীতে। করুণাময়ীই এ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক।

বলেছিলেন, 'বাড়ীতে এনে ভরে রেখে তারপর বৌ করে বরণ করা সে যে একেবারে পুতুলের বিয়ের বেহদ্দ। ওর থাকার ব্যবস্থা আমি করছি। যা দেখছি, বিয়ে তুমি ওকে করবেই, তবু লোক সৌষ্ঠবটা তো রাখতে হবে।'

হ্যাঁ, প্রথমটা এমনি কঠিনই হয়েছিলেন করুণাময়ী। কিন্তু মল্লিকার নম্রতা, মল্লিকার দুঃখগাথা, আর মল্লিকার রূপ, এই তিন অস্ত্রে ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়ছিলেন।

তা' মেয়েরাই কি মেয়েদের রূপে মুগ্ধ হয় না? হয় বৈকি। রূপকে হৃদয়ের নৈবেদ্য না দিয়ে উপায় কোথায় মানুষের? প্রকৃতিই যে তাকে এই দুর্বলতার কাছে মেরে রেখেছে।

তবু তল্লাস করতে ছাড়লেন না।

রীতিমত তোড়জোড় করেই তল্লাস করলেন, রিষড়েয় আঠারো বিশ বছর আগে সুরেশ মুখুয্যে বলে কেউ ছিল কি না।

যে লোককে পাঠিয়েছিলেন, সে এসে বিস্তারিত বললো, 'হ্যাঁ, ছিল বৈ কি, ছিল। সেই সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতিরা তো রয়েছে এখনো রিষড়েয়।'

সুরেশ মুখুয্যে মরেছে অনেকদিন, তার স্ত্রী কন্যা ছিল। মেয়েটাকে নিয়ে দুঃখুকষ্ট করে চালাচ্ছিল ও, কিন্তু সুরেশের স্ত্রীও মরল। আর সেই খবর পেয়ে তার ভাই অর্থাৎ ওই আপনাদের মেয়ের মামা মাদ্রাজ না পাঞ্জাব কোথা থেকে এসে মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল। তারপর কে কার খবর রাখে! অবিশ্যি একথা বলতে ছাড়েন নি সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা, 'মেয়েটাকে আমার কাছে রাখবার জন্যে ঢের চেষ্টা করেছিলাম মশাই, বলি ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকুক, বিশ্ব বাংলা ছেড়ে

কোথায় যাবে? দেখেশুনে বে থা আমরাই দেব। কিন্তু মামাটি মশাই রগচটা। বলল 'না না, ও আমার কাছেই থাকবে ভাল।' বলি—তবে তাই হোক। ভাল থাকলেই ভাল। তারপর মশাই কে আর খবর রাখছে?'

ভদ্রলোকের কথার বাঁধুনি দেখে অবশ্য বোঝবার উপায় ছিল না তাঁর সেই মহানুভবতার গল্পটি গল্পই মাত্র।

করুণাময়ীর প্রেরিত লোক এসে সেই কথাই বলে, 'বংশ ভাল বলেই মনে হ'ল। কাকাটি অতি ভদ্র। পাজী ছিল ওই মামাটা। নিজে তো চিরকাল বাউণ্ডুলে, বাপ মিনসে মেয়ে জামাইকে কাছে নিয়ে রেখেছিল, তা' সেই বাপ মরতে নাকি গরীব বোন ভগ্নিপতিকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে বেচে কিনে চলে গিয়েছিল। কাকা তাই বলছিল—বৌ মরেছে? হাড়ির হাল হয়েছে? বেশ হয়েছে, হবেই তো! অমন লোকের দুর্দশা হবে না তো কার হবে? পাজী লোকের পয়সা কখন থাকে না।'

তা' না থাক, করুণাময়ীর শান্তিটা থাকল। তাঁর কোঁচকানো ভুরু কিছুটা সোজা হ'ল। বৌ বরণ করে ধরে তুললেন তিনি।

কিন্তু করুণাময়ীর পতিকুলেই কি জ্ঞাতি নেই? না তাঁদের ভুরু নেই?

এ যুগে যে 'সমাজ' নামক শব্দটার কোনও অর্থ নেই এ তাঁরা জানলেও, এবং নিজেরা সমাজকে সম্যকরূপে না মানলেও, এ বিয়ের যজ্ঞিতে খাওয়া-দাওয়ায় অনিচ্ছে প্রকাশ করতে ছাড়েন নি তাঁরা। আর এ কথাও বলেছিলেন, ওই একটা অজ্ঞাত কুলশীল মেয়েকে প্রভাত হঠাৎ ঘাড়ে করে নিয়ে এসে বিয়ে করতে বসা দেখে তাঁরা এত বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন যে, হয়তো করুণাময়ীর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক ছেদ করতে হবে তাঁদের।

করুণাময়ী ' র সেই জ্ঞাতিদের রিষড়ের সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতির ঠিকানা দি ন। বললেন 'খোঁজ করে এসো।'

খোঁজ? এম পাগল আবার কে আছে, যে গাঁটের কড়ি খরচা

করে তথ্যানুসন্ধানে যাবে? হাওড়া থেকে রিষড়ে গোটাকতক পয়সার মামলা? তাতে কি? তাই বা কেন? জ্ঞাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক চোকালেই যখন সব চুকে যায়।

শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি সম্বন্ধ চুকল না। আর ভোজবাড়ীতে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়র স্বাদ নিতেও কার্পণ্য করলেন না তাঁরা, তবে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে। মোটকথা পাত্র পাত্রী দু' পক্ষের মধ্যে 'লাখ কথা' না হলেও, সেই লাখ কথাটা এক পক্ষেই হল।

তবু শেষ অবধি সবই হ'ল।

'বিয়ে' নামক অনুষ্ঠানটির যে মোহময় এবং ভাবময় ছবিখানি আঁকা ছিল বর আর কন্যার হৃদয়পটে, সে ছবি মলিন হ'ল না। সেই 'গায়ে হলুদ আর ছাঁদনাতলা, কুশণ্ডিকা আর কড়ি খেলা' এয়োদের হুড়োহুড়ি আর তরুণীদের বাড়াবাড়ি, ইত্যাদি সপ্তসমুদ্র পার হয়ে অবশেষে ফুলশয্যার ঘাটে তরা ভিড়ল।

পুষ্প আর পুষ্পসারের সম্মিলিত তীব্র মধুর গন্ধে উতলা হয়ে উঠল বাতাস, আর পরিহাস রসিকার দল বিদায় নেওয়ার পরেও যেন ঘরের মধ্যে উত্তাল হয়ে রইল তাদের পরিহাসের উদ্দামতা।

'আমার জন্যে কতো জ্বালা তোমার!'

মল্লিকা গভীর কালো চোখ দুটি তুলে তাকায়।

প্রভাত সেই গভীর দৃষ্টির ছায়াকে নিবিড় করে তুলে আবেগ কাঁপা গলায় বলে, 'হ্যাঁ ভারী জ্বালা! অনেক জ্বালা!'

'না সত্যি। কে জানে কেন কুগ্রহের মত হঠাৎ—এসে পড়লাম তোমার জীবনের মধ্যে—'

'বোধকরি কোন সুগ্রহের আশীর্বাদে—'

'চিরদিন কি এ স্নেহ রাখতে পারবে তুমি আমার ওপর?'

'সন্দেহ কেন মল্লিকা?'

'না গো না, ভুল বুঝো না তুমি আমায়। সন্দেহ নয় ভয়।'

'ওটা বড্ড সেকেলে, বড্ড পুরোনো। শরৎবাবুর উপন্যাসের নায়িকার উক্তির মত।'

মল্লিকা আবার সেই গভীর চোখ দুটি তুলে তাকায়। মল্লিকাকে আর 'রূপসী' বলে মনে হয় না, মনে হয় লাবণ্যময়ী। রমণীয় নয় কমনীয়। বিদ্যুৎ নয়' গৃহদীপ।

সেই আরতির দীপের মত দৃষ্টিটি তুলে মল্লিকা বলে, 'তা ভাগ্য যাকে উপন্যাসের নায়িকা করে তুলেছে—'

'তা বেশ তো। সেকেলে উপন্যাসের কেন?' হেসে ওঠে প্রভাত, 'আধুনিক উপন্যাসের নায়িকা হও। যারা প্রতি পদে ভয় পায় না, প্রতি পদে নিজেকে ছোট বলে মনে করে না। সাহসিকা তেজস্বিনী—'

ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয় প্রভাত আইন এবং অনুষ্ঠান উভয় শক্তিতে লাভ করা সদ্য লব্ধাকে।

মল্লিকা ভেঙে পড়ে।

অস্ফুট স্বরে বলে, 'না না, ও সব কিছু হতে চাই না আমি আমি শুধু 'বৌ' হতে চাই। বাংলার গ্রামের বৌ। যে বৌয়ের ছবি দেখেছি জীবনের শৈশবে। যারা পবিত্র সুন্দর মহৎ।'

'নাঃ বড্ড বেশী সিরিয়াস হয়ে উঠছ। মনে রেখো এটা আমাদের ফুল শয্যার রাত্রি।'

পরিবেশ হালকা করে তুলতে চায় প্রভাত। জীবনের এই পরম রাত্রিটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চায় না কতকগুলো ভারী ভারী কথায়। বিয়েটাকে একেবারে সাধারণ বিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেই বা ক্ষতি কি?

এ বিয়েতে কাকিমা অবশ্য আসেন নি। খবর পেয়ে নিজের গালে মুখে চড়িয়েছেন, আরও আগে কেন গেঁথে ফেলেন নি বলে। আর শেষ আক্ষেপের কামড় দিয়েছেন বড়জার কাছে চিঠিতে, তাঁর বোন ভগ্নিপতি কী পরিমাণ দানসামগ্রী, আর কী পরিমাণ নগদ গহনা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তার হিসেব দাখিল করে।

করুণাময়ী একবার কপালে করাঘাত করেন, আবার একবার ভাবেন, 'মরুকগে! সে হ'লে ছেলেটা তো আমার স্রেফ্ ছোট

গিন্নীর সম্পত্তি হয়ে যেত।'

প্রভাত হাসে মল্লিকার কাছে। বলে, 'উঃ, ভাগ্যিস ওই দানসামগ্রী আর নগদের কবলে পড়ে যাইনি!'

ওদের হাওড়ার বাড়ীতে এখনও গ্রাম গ্রাম গন্ধ। ঘরে গৃহদেবতা, উঠোনে তুলসীমঞ্চ, রান্নাঘরে শুচিতার কড়া আইন।

তা ছাড়া গোহালে আছে গরু, পুকুরে আছে মাছ।

মল্লিকা বিভোর হয়, বিগলিত হয়। এই তো ছিল স্বপ্ন।

ভাবে, ভগবান, আমার জন্যে এত রেখেছিলে তুমি!

প্রথম প্রথম সর্বদা একটা অশুচিতাবোধ তাকে সব কিছুতে বাধা দিতো। শাশুড়ী ডাকতেন, 'বৌমা, আজ লক্ষ্মীপূজো, ঘর-দোরে একটু আলপনা দিতে হয়। পারবে তো? মেলেচ্ছ দেশে মানুষ, দেখনি তো এ সব। যাক, যা পারো দাও।'

মল্লিকা ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারাটা তার নেহাৎ যেমন তেমন হয় না। মনের জগতে ভেসে ওঠে শৈশবে-দেখা মায়ের হাতের কাজ। এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে আলপনা দিতে ডাকতো মল্লিকার মাকে, ডাকসাইটে কর্মিষ্ঠে ছিলেন তিনি।

শাশুড়ী প্রীত হ'ন। ভাবেন—নাঃ যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়। সদ্ ব্রাহ্মণের আচার জানে। ডাকেন, 'বৌমা, একখানা সিল্কের শাড়া টাড়ী কিছু জড়িয়ে আমার ঠাকুরঘরে একবার এসো তো। চন্দন ঘষে, ফুলকটায় একটু মালা গেঁথে দেবে।'

মল্লিকা কম্পিত চিত্তে ভাবে, এই মুহূর্তে ভয়ানক একটা কিছু হয় না তার! হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কি ওই রকম কিছু?

শাশুড়ী ডাকেন 'কই গো বৌমা—'

ছুটে যাওয়া ভিন্ন গতি থাকে না। ক্রমশঃ ভয় ভাঙে। নিজেই এগিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রে কাতরতায় ভেঙে পড়ে। বলে 'আমার এত পাপ হচ্ছে না?'

প্রভাত আদরে ডুবিয়ে দেয়। বলে, 'কী আশ্চর্য! পুণ্যি না হয়ে পাপ হবে? এসব তো পুণ্যকর্ম, বরং যদি কিছু পাপ থেকে থাকে, ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু এখনো এত কাতর কেন তুমি মল্লিকা? আমি তো তোমায় বলেছি, স্বেচ্ছায় অন্যায় না করলে পাপ স্পর্শ করে না।'

ধীরে ধীরে বুঝি কেটে যায় সমস্ত গ্লানি। নতুন আর-একজন্মে জন্ম নেয় মল্লিকা। মন বদলেছে, দেহটাও বুঝি বদলাচ্ছে।

নখের আগায় নেল্ পলিশের বদলে হলুদের ছোপ, ঠোঁটে লিপস্টিকের বদলে পানের রাঙা, সুর্মাবিহীন চোখ নম্র কোমল। শাড়ী পরার ভঙ্গিমা বদলে ফেলেছে মল্লিকা, বদলেছে জামার গড়ন।

মল্লিকা আস্তে আস্তে তার মার মত হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যবতী সতী মায়ের মত। যে মা তার খেটে খেয়েছে, কিন্তু সম্মান হারায় নি।

কিন্তু অনাবিল সুখ মানুষের জীবনে কতক্ষণ? প্রভাতের কাকার চিঠি আসে, 'বিয়ে তো আমরাও একদা করেছিলাম বাপু, কিন্তু এভাবে উচ্ছন্ন যাইনি। আর বেশী ছুটি নিলে চাকরীতেই ছুটি হয়ে যাবে। শীঘ্র চলে এসো। এবার একেবারে খোদ রাজধানী। তাছাড়া কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।'

অর্থাৎ নানা টালবাহানা করে করে মেডিক্যাল লিভ্ নিয়ে নিয়ে যে বিভোর গৃহসুখের জগতে বাস করছিল প্রভাত, তার থেকে বিদায় নিতে হবে।

কিন্তু বিদায়ই বা কেন? কোয়ার্টার্স তো পাওয়া যাচ্ছে।

এখনো ভাইপোর জন্য কাকার দরদের পরিচয়ে কাকিমা বিরূপ, কিন্তু কাকা নিজ নীতিতে অটল আছেন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মাকে দেখায় প্রভাত। মা বলেন, 'তা বটে! কিন্তু আমার যে অভ্যেস খারাপ করে দিলি বাবা! বৌমাটিকে ছেড়ে—'

প্রভাত বলে, 'উঃ মা। নিজের ছেলেটিকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলে—'

মা হাসেন। বলেন, 'কী করবো। মেয়েটা বড় মায়াবিনী!'

'মায়াবিনী' শব্দের নতুন অর্থে হাসে প্রভাত।

আর মল্লিকাকে গিয়ে ক্ষ্যাপায়, 'ওগো মায়াবিনী, কি মায়া জানো!'

মল্লিকার চোখে কিন্তু শঙ্কা ঘনায়।

দিল্লী!

দিল্লী যে বাঘের গুহার তল্লাটে! মামাকে মাঝেমাঝেই আসতে হয় দিল্লীতে! 'মামার বেশীর ভাগ খদ্দের আসে দিল্লী থেকে!'

প্রভাত বলে, 'দিল্লী কত বড় শহর, কত তার লোকসংখ্যা! কে সন্ধান রাখবে, কোন কোয়ার্টার্সে সেই মিসেস ব্যানার্জি বাস করেন, যার পুরনো নাম ছিল মল্লিকা।'

'না গো, আমার ভয় করছে!'

'তবে চাকরীবাকরী ছেড়েই দেওয়া যাক, কি বলো?'

'তাই দাও না গো!' মল্লিকা লুটিয়ে পড়ে। 'কলকাতায় একটা চাকরী জোগাড় করে নিতে পারবে না?'

'হয়তো পারি। কিন্তু লোকের কাছে 'পাগল' নাম কিনতে চাই না, বুঝলে? কেন ভয় পাচ্ছো?'

কিন্তু ভয়! ভয়! ভয় যে মল্লিকার স্নায়ুতে শিরাতে পরিব্যাপ্ত! কি করে তার হাত এড়াবে সে? কেউ যদি দেখতে পায়? যদি সে গিয়ে মামাকে খবর দেয়? যে মামা দেখতে নিতান্ত নিরীহ হলেও বাঘের মতই ভয়ঙ্কর। কে বলতে পারে অসতর্ক প্রভাতের তাজা রক্তে একদিন দিল্লীর রাস্তা ভিজে উঠবে কি না।

তাই শেষ পর্যন্ত মল্লিকার ভয়ই জয়ী হয়।

লোকের কাছে 'পাগল' নামই কিনে বসে প্রভাত।

কাকাকে লিখে পাঠায় বাংলার বাইরের রুক্ষ জলবায়ু তার ঠিকমত সহ্য হয়নি। এখন তো আরো হবে না, কারণ শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। নচেৎ কেন এতবার মেডিক্যাল লিভ্ নিতে বাধ্য হচ্ছিল?

অতএব?

পৌনে পাঁচশ টাকার চাকরী? তা' কি আর করা যাবে?

প্রভাতের দুই দাদা, যাঁরা বাড়ীর মধ্যেই আড়াল তুলে মায়ের সঙ্গে পৃথকান্ন হয়ে বাস করছেন, তাঁরা ছি ছি করেন, এবং পুরাণ উপপুরাণ থেকে সুরু করে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত স্ত্রীর বশ পুরুষের কী কী অধোগতি হয়েছে তার নজীর দেখান।

কাকা চিঠির মারফৎই সম্পর্ক ছেদ করেন, এবং পাড়া-প্রতিবেশী গালে হাত দেয়।

'দিল্লী' নামক ইন্দ্রপুরীর স্বর্গীয় চাকরী যে কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়, এ লোকের ধারণার বাইরে।

শুধু করুণাময়ী।

করুণাময়ী ছোট ছেলের এই সুমতিতে পাঠবাড়ীতে হরিরলুট দিয়ে আসেন।

ধারে কাছে দুই ছেলে বৌ, কিন্তু করুণাময়ী থাকতেন বেচারীর মত। নিঃসহায় নিরভিভাবক। অথচ তেজ আছে ষোল-আনা, তাই পৃথকান্ন ছেলেদের সাহায্য নিতেন না। অসময়ে দরকার পড়লে, বরং পাড়ার লোকের কাছে জানাতেন তো ছেলেদের নয়।

শাশুড়ীর এই অহঙ্কারে ছেলের বৌরাও ডেকে কথা কইতো না।

প্রভাত এসে পর্যন্ত করুণাময়ী একটা সহায় পেয়েছেন। তা ছাড়া ছোটবৌয়ের রূপগুণ। যেটা বড় মেজ বৌকে 'থ' করে দেবার মত। করুণাময়ীও একটা রাজত্বের অধীশ্বরী হয়েছিলেন এই ক'মাস।

তবু মনের মধ্যে বাজছিল বিদায় রাগিনী। ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে এই আবুহোসেনের রাজ্যপাট। ফুরিয়ে যাবে সংসার করা।

ছুটি ফুরোলেই বৌ নিয়ে লম্বা পাড়ি দেবে প্রভাত, আর আবার দুই বৌয়ের দাপটের মাঝখানে পড়ে করুণাময়ীকে শুধু হরিনামের মালা সম্বল করে মানমর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

বেশ করেছে প্রভাত দূরের চাকরী ছেড়ে দিয়ে।

তেমন চেষ্টা করলে কি আর কলকাতায় একটা চাকরী জুটবে না?

তা' মাতৃআশীর্বাদের জোরেই হোক আর চেষ্টার জোরেই হোক— কলকাতায় চাকরী জোগাড় হয়।

প্রভাত এসে মাকে প্রণাম করে বলে, 'মাইনে অবিশ্যি এখানে ও চাকরীর থেকে কম, কিন্তু ভবিষ্যৎ খারাপ নয়।'

করুণাময়ী আশীর্বাদের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়ে বলেন, 'তা হোক। তা হোক। ঘরের ছেলে ঘরেব ভাত খাবি, কী বা খরচ! আমি বলছি এই চাকরীতেই তোব উন্নতি হবে।'

'তা হলে খুশি?'

'হ্যাঁ বাবা, খুব খুশি।'

ঘরে গিয়ে মল্লিকাকেও সেই প্রশ্ন করতে যায়। কিন্তু ঘরে পায় না মল্লিকাকে।

কোথায় সে?

রান্নাঘরে? ভাঁড়ার ঘরে? ঠাকুরঘরে? গোহালে?

না। ছাদে উঠেছে মল্লিকা।

প্রভাত এসে আলশের ধারে বসে পড়ে। বলে, 'উঃ, খুব খাটালে। এই চূড়োয় উঠে বসে আছো যে?'

'খুঁজবে বলে।' মল্লিকা হাসে।

কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ দেখায়।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আজ আমার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'ইস! সেইরকম বাড়ী কিনা তোমাদের!'

'আহা, বাড়ী মানে তো বড়বৌদি মেজবৌদি! ওদের নিন্দেয় কিছু এসে যায় না। যাক, খুশি তো?'

খুশি!

মল্লিকা অমন চমকে ওঠে কেন?

কেন বলে, 'কিসের খুশি?'

'বাঃ, চমৎকার! দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কছেদের পাকা বনেদ গাঁথা হলো না? 'ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রির' কাজটা পেয়ে গেলাম না আজ!'

'ওমা! তাই বুঝি! সত্যি হলো?' মল্লিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রভাতের হঠাৎ মনে হয় মল্লিকার এই উচ্ছ্বাসটা যেন

রঙ্গমঞ্চের অপটু অভিনেত্রীর 'শেখা ভঙ্গীর' মত।

ভুরু কুঁচকে বললো, 'কই, খুব খুশি তো মনে হচ্ছে না।'

মল্লিকা জোর হেসে উঠলো, 'কী যে বলো! আমি বলে তোমাদের ঠাকুরের কাছে পূজো মেনেছিলাম, যাতে তোমার আগের চাকরীটা ঘোচে, এখান থেকে আর কোথাও যেতে না হয়।'

প্রভাত হাসে। বলে, 'আমাদের ঠাকুর নয়, তোমার ঠাকুর, সকলের ঠাকুর।'

মল্লিকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গো মশাই, তাই।'

তবু প্রভাতের মনে হয় মার কাছে যে আন্তরিক অভিনন্দন পেলো, মল্লিকার কাছে বুঝি তেমন নয়। অথচ মল্লিকার জন্যেই তো—

কেন? এখানে টাকার অঙ্ক কম বলে? কিন্তু তাই কি হতে পারে? মল্লিকার দিল্লীর ভীতি তো দেখেছে সে? তবে কেন তেমন খুশি হলো না মল্লিকা?

কিন্তু সত্যিই কি মল্লিকা খুশি হয়নি? নিজেই সেকথা ভাবছে মল্লিকা।

খুশি খুশি, খুশিতে উপচে পড়া উচিত ছিল তো তার। কিন্তু তেমন হচ্ছে না কেন?

কেন হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতাবোধ সমস্ত স্নায়ু, শিরাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে কোথায় বুঝি একটা মস্ত জমার ঘর ছিল তার, সে ঘরটা সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কী সেই জমা? কী সেই ফুরিয়ে যাওয়া?

গভীররাত্রে যখন প্রভাত ঘুমিয়ে পড়েছে, আর প্রভাতদের এই পাড়াটা, নিঃঝুম নিঃসাড় হয়ে যেন ছায়া দৈত্যের মত ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, তখন মল্লিকা বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়।

জানালার ঠিক নীচেটাতেই খানিকটা ঝোপ, তা থেকে কেমন বুনো বুনো গন্ধ আসছে। মল্লিকার মনে হ'ল এ গন্ধ যেন জোলো ভাব প্রবণতার, সস্তা উচ্ছ্বাসের।

আগে, অনেকদিন আগে এমনি করে মাঝরাতে উঠে জানলার ধারে কি দাঁড়াত না মল্লিকা? দাঁড়াত বৈকি, দাঁড়াত। কিন্তু সে জানলা খুলতেই এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে যে গন্ধ এসে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ধাক্কা দিত, সে গন্ধ বনকচু আর আশ-শ্যাওড়ার নয়। সে গন্ধ যেন অদূরে বিচরণশীল বাঘের গন্ধ। যার মধ্যে ভয়ঙ্কর এক ভয়ের রোমাঞ্চ, উগ্র এক মদের স্বাদ!

আর উদ্দাম সেই পাহাড়ী ঝড়।

যে ঝড় হঠাৎ কোনও এক রাত্রির বুক চিরে ক্রুদ্ধ গর্জনে ছুটে আসতো কোন দূর-দূরান্তরের অরণ্য থেকে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুতো মারতো পাহাড়ের গায়ে গায়ে। তার সেই উন্মত্ত আক্ষেপের ফোঁস্-ফোঁসানিতে উত্তাল হয়ে উঠতো দেহের সমস্ত রক্ত কণিকা, সমস্ত প্রাণ আছড়ে পড়তে চাইত অজানা কোনও এক ভয়ঙ্করতার মধ্যে।

জীবনে আর কোনও দিন সেই দূর অরণ্যের দুরন্ত ডাক শুনতে পাবে না মল্লিকা? দেখতে পাবে না ঝড়ের সেই মাতামাতি?

আচ্ছা মামা কি এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছেন মল্লিকাকে? দেখতে পেলেই একখানা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেলবেন বলে। যতদূর নয় ততদূর বেইমানী তো করে এসেছে মল্লিকা তাঁর সঙ্গে।

তা' বেইমানী বৈ কি। তা' ছাড়া আর কি।

মামা তার জীবনের ভয়ঙ্কর এক রাহু, কিন্তু মামা তার জীবন দাতাও নয় কি? মল্লিকা যে এই মল্লিকা হল, যে মল্লিকা ভাবতে জানে, স্বপ্ন দেখতে জানে, জীবন কি তা' বুঝতে জানে সে মল্লিকাকে গড়ল কে?…কোথায় থাকতো সেই মল্লিকা, মামা যদি তাকে নিয়ে না যেত।

মামা নিয়ে না গেলে তো তাদের সেই রিষড়ের বাড়ীতে কাকাদের আশ্রয়ে গণ্ডমুখ্য গাঁইয়া একটা মেয়ে হয়ে পড়ে থাকতে হতো মল্লিকাকে, হয়তো কোন্ কালে হতভাগা একটা বরের সঙ্গে

বিয়ে হয়ে যেত, হয়তো একপাল ছেলেমেয়েও হতো এতদিনে। পাহাড়ী ঝড়ের উন্মত্ত রূপ কোনদিন দেখতে পেত না মল্লিকা, দেখতে পেত না হঠাৎ বিদ্যুতের মত বাঘের গায়ের হলুদ কালো ডোরা।

তবে মামাকে সে বন্ধু বলবে, না শত্রু বলবে?

হঠাৎ একটা ঝোড়ো ঝোড়ো বাতাস ওঠে, আর সেই বাতাসের শব্দের মধ্যে যেন হা হা করা একটা হাসি ভেসে আসে। অনেক-গুলো মাতালের সম্মিলিত হাসি।...হাজার মাইল দূর থেকে কেমন করে ভেসে এল এ হাসি!

বুক কেঁপে উঠল মল্লিকার।

আর ঠিক সেই সময় বুঝি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই পিঠের উপর একখানা স্নেহ কোমল হাত এসে পড়ল।

প্রভাত ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে।

নরম গলায় বলছে, 'এমন করে—দাঁড়িয়ে আছো কেন মল্লিকা? ঘুম আসছে না?'

ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে মল্লিকা। রুদ্ধ গলায় বলে, 'তুমি কেন ঘুমিয়ে পড়? তুমি কেন আমার সঙ্গে জেগে থাক না?'

সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেয় প্রভাত—এ হচ্ছে মল্লিকার অভিমান। সত্যি মল্লিকা যখন জেগে বসে আছে, তখন এমন অচৈতন্য হয়ে ঘুমনো উচিত হয়নি প্রভাতের। তাই ওকে কাছে টেনে নেয়, আরও নরম গলায় বলে, 'সত্যি মল্লিকা, আমি একটা বুদ্ধু।'

এমন স্বীকারোক্তির পর পরিস্থিতি নিতান্ত সহজ হয়ে যেতে দেরী হয় না, কিন্তু সেই সহজ সুর কি স্থায়ী হয়? মাঝে মাঝেই কেটে যায় সে সুর। মাঝে মাঝেই বিস্বাদ হয়ে ওঠে মল্লিকার, এই ছকে বাঁধা সংসারের সুনিপুণ ছন্দ।

কিন্তু ঘরকুনো প্রভাত বড় খুশিতে আছে।

হাওড়া থেকে বালি, অফিস থেকে বাড়ী। খাবার ঘর থেকে

শোবার ঘর, মার স্নেহচ্ছায়া থেকে স্ত্রীর অঞ্চলছায়া।

তাঁতির মাকুকে এর বেশী আর ছুটোছুটি করতে হয় না। আবাল্যের পরিবেশ মনকে সর্বদা সুধারসে সিক্ত করে রাখে, মাঝখানের বিদেশবাসের তিনটে বছর ছায়ার মত বিলীন হয়ে যায়।

এতদিনে বুঝি প্রভাত জীবনের মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু মল্লিকা ক্রমশঃ জীবনের মানে হারাচ্ছে কেন? কেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে? স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে?

হয়তো বা মাঝে মাঝে একটু রুক্ষও।

এতদিন ভোর থেকে সুরু করে রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থালীর কাজগুলির ভার পেয়ে যে সে প্রতিমুহূর্তে কৃতার্থ হয়েছে। বিগলিত হয়েছে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে, লক্ষ্মীর ঘরে ধূপ ধুনো দিতে পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের জন্যে মালা গাঁথতে, চন্দন ঘসতে।

সেই কৃতার্থমন্যতা কোথায় গেল?

কাজগুলো যান্ত্রিক হয়ে উঠছে কেন?

সংসারী গৃহস্থের মূর্তপ্রতীক প্রভাত। সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে অসময়ের ফুলকপির জোড়া হাতে ঝুলিয়ে, ভাবতে ভাবতে আসে, মাকে বলবে, 'মা, দুটোই যেন তুমি চিংড়িমাছ দিয়ে রেঁধে শেষ করে দিয়ো না। তোমার নিরিমিষ ঘরে রাঁধবে একটা—'

মল্লিকার মধ্যেকার সুর কেটে যায়।

প্রভাত কেন এমন জোলো, এমন ক্ষুদ্র সুখে সুখী?

এমনি এক সুর কাটা সন্ধ্যায়, যখন প্রভাতের মা গিয়েছেন পাঠ বাড়ীতে পাঠ শুনতে, আর নির্জন বাড়ীর দালানের একেবারে একটেরে ছোট্ট একটা তোলা উনুন জ্বেলে মল্লিকাকে ক্ষীর জ্বাল দিতে হচ্ছে শাশুড়ীর রাতের খাওয়ার জন্যে, খিড়কির দরজায় হুড়কো ঠেলার শব্দ হ'ল।

পাড়া গাঁয়ের প্রথামত হুড়কোটা এমন ভাবে ঠেকানো থাকে, যাতে বাইরে থেকেই খুলে বাড়ীতে ঢোকা যায়। আর সে পদ্ধতিটা বাড়ীর সকলেরই জানা থাকে। প্রভাতও প্রায়শঃই এই পিছন দরজা দিয়ে

ঢোকে। শব্দটা শুনে মল্লিকা ভাবল তাই হবে, প্রভাতই এসেছে। আর তাকিয়ে দেখল না।

অন্যদিন হলে হয় তো মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখতো, কিন্তু আজকের সন্ধ্যার সুর কাটা। আজ আর মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে না। বরং আরও ঘোমটা টেনে হেঁট মুখে কড়ায় হাতা নেড়ে নেড়ে দুধ জ্বাল দিতে থাকে। পরণে একখানা লাল হলুদে ছাপ মারা সিল্কের শাড়ী আর শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে মিলানো একটি লাল সিল্কের ব্লাউস। যদিও সাজটা বাহারী তবে এ একেবারে ভঁড়ার ঘরের আলনায় রাখা বিশুদ্ধ। ক্ষীর জ্বাল না হওয়া পর্য্যন্ত এ পরে কাউকে স্পর্শ করার উপায় নেই।

প্রভাত প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় এসে এই দৃশ্যটিই দেখে। মা পাঠবাড়ীতে যান, ঝিটা সারাদিনের কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যার মুখে বিদায় নেয়, আর মল্লিকা বিশুদ্ধ শাড়ী পরে শাশুড়ীর রাতের খাওয়ার ক্ষীর জ্বাল দেয়।

প্রভাত অনুযোগ করে, 'কাজটা একটু আগে আগে সেরে রাখতে পার না? সারাদিনের পর বাড়ী এসে ঝপ করে একটু ছুঁতে পাই না। এ যেন বক্ষে অগাধ তৃষ্ণা, অথচ সামনে লবন সমুদ্র।'

মল্লিকা ভ্রুভঙ্গী করে উত্তর দেয় 'তৃষ্ণাটা একটু কমাও, বাড়ীর যখন এই ব্যবস্থা। গরু দোহা হবে সন্ধ্যার মুখে। আমাদের ওখানে তো বেলা চারটে না বাজতেই—' কথাটা প্রায়শঃই শেষ হয় না। যে কোন সময় অসতর্কে 'আমাদের ওখানে' বলে ফেলেই থেমে যায় মল্লিকা। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'চারটে পাঁচটার সময় দুধটা দোহা হলে ঠিকই কাজ সেরে রাখতাম।'

কিন্তু এসব হচ্ছে যেদিন ভিতরের সুর ঠিক থাকে। তাল ভঙ্গ হয় না। আজ আর ঠিক তেমনটি ছিল না। আজ মল্লিকার ভিতরের সুর গেছে কেটে, তার গেছে ঢিলে হয়ে।

আজ তাই খিড়কির হুড়কো ঠেলে যে ব্যক্তি ঢুকলো, তার দিকে উদাস একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মল্লিকা নিজের কাজ করে চলে।

কিন্তু বাড়ীতে যে ঢুকলো সে কি প্রভাত ?

মল্লিকা ত্রস্ত হল।

তারপর দেখল পরিমল। বছর কুড়ি বাইশের একটি সুকান্তি ছেলে। ফরসা রং, চুলগুলি উল্টে আঁচড়ানো, পরণে একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবী। মুখে মৃদু হাসি।

'জ্যেঠিমা বাড়ী নেই ?' বলল ছেলেটা।

মল্লিকা বৌগিরি বজায় রেখে আস্তে বলে, 'মা তো রোজই এ সময় পাঠ শুনতে যান।'

'আর প্রভাতদা ?'

'সেও তো সেই কখন ফেরে।'

ছেলেটা দাওয়ার একধারে বসে পড়ে বলে ওঠে, 'এ ভারী অন্যায় প্রভাতদার। আপনি এই সন্ধ্যাবেলা একা থাকেন। ওর একটু আগে ফেরাই উচিত। পাঁচটায় তো ছুটি হয়ে যায় ওর।'

ছেলেটা প্রভাতের খুড়তুতো ভাই, একটু বেশী বাক্যবাগীশ। তবে 'জ্যেঠিমা' অর্থাৎ প্রভাতের মার কড়া দৃষ্টির সামনে সে বাক্যস্রোত রুদ্ধ রাখতে হয়। সেই রেখেই আসছে। আজ এমন নির্জন বাড়ীতে বৌদিকে একা পেয়ে তার বাক্যের ধারা উথলে ওঠে……

প্রভাত সম্পর্কে ওই মন্তব্যটুকু সেই উথলে ওঠার সূচনামাত্র। কথাটা নিতান্তই বলার জন্যে বলা।

কিন্তু তুচ্ছ এই কথাটুকুই যেন মল্লিকার সমস্ত স্নায়ু শিরা ধরে নাড়া দিয়ে গেল। ওর মনে হয়, সত্যিই তো ? এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়। এই নির্জন সময়টুকু প্রভাত ইচ্ছে করে নষ্ট করে। এ সময় ও যায় বাজার ঘুরে নতুন ফুলকপি কি অসময়ের আম, গঙ্গার ইলিশ কি টাটকা ছানা সওদা করতে।

ছি ছি।

নিশ্চয় প্রভাতের মনের মধ্যে নেই আগ্রহের ব্যাকুলতা। তাই খুড়তুতো দেওরের এই কথায় বিদ্যুৎ শরাহতের মত উঠে দাঁড়িয়ে

সরে এসে বলে, 'উচিত কাজ তোমাদের এই বাড়ীতে কে বা করছে। নইলে তোমাদের দাদার কি উচিত ছিল এই আমাকে বিয়ে করা?'

'কী মুস্কল! সেটা আবার কী এমন অনুচিত হলো? আমরা তো নিত্য প্রভাতদাকে হিংস্রে না করে জল গ্রহণ করি না।...'

'ভুল—ভুল, সব ভুল। উচিত হয়নি আমাকে বিয়ে করা। বনের পাখীকে ধরে খাঁচায় এনে পোরা।'

ছেলেটা হেসে উঠে বলে, 'তা সুন্দর পাখীটি দেখলে, কেই বা না চেষ্টা করে তাকে ফাঁদ পেতে ধরে ফেলে খাঁচায় পুরতে। সত্যি চাকরী করতে বিদেশে তো সবাই যায়, প্রভাতদার মত এমন অচিন দেশের রাজকুমারীর দেখা কে পায় বলুন?'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে মল্লিকা। সহসা চকিত করে তোলা বাচাল হাসি। এ হাসি আজও মনে আছে মল্লিকার? আজও পারে এ হাসি হাসতে? এ ওকে চেষ্টা করে করতে হল না? অনেকগুলো মাতালের সম্মিলিত হাসির বিপরীতে। চেষ্টা করে আনা, শেখানো বাচাল এই হাসি মল্লিকার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে না কি?

কখন গেছে?

কোন অসতর্কতায়?

ছেলেটা বোধকরি সহসা এই বাচাল হাসির ঘায়ে বিমূঢ় হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে হাঁ করে, আর লজ্জায় লাল হয়ে যায় মল্লিকার পরবর্তী কথায়; 'অচিন দেশের রাজকুমারীটিকে দেখছি ন' ঠাকুরপোর বেজায় পছন্দ! একটু আধটু প্রসাদ কণিকা পেয়ে ধন্য হতে চাও তো বল। রাজকুমারী কৃপণ নয়। তার ভাঁড়ারে অনেক ঐশ্বর্য্য।'

বাক্য বাগীশ ছেলেটা তার বাক্য স্রোত হারিয়ে ফেলে নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী বলছেন?'

'বলছি তোমার মাথা! যে মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। সাধে কি আর তোমাদের এই বাংলাদেশে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে আমার? নাও সরো। সরে বোসো। এখান দিয়ে আমাকে রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে ছোঁওয়া গেলে তো জাতিপাত।'

ছেলেটা ত্রস্ত হয়ে সরে বসে।

মল্লিকা একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে পড়ে, রান্নাঘর থেকে বাটি আনতে।

শাশুড়ীর স্পেসাল পিতলের বাটি, যেটি দেখতে ছোট 'খোলে' বড়।

কিন্তু সেই বাটিটি নিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অবোধ ছেলেটা একটা বেখাপ্‌পা কথা বলে বসে।

বলে, 'সাধে কি আর এত মোহিত হয় লোকে? সুন্দর মানুষদের সবই সুন্দর। রাগও অপূর্ব।'

'তাই না কি?' মল্লিকা চোখে বিদ্যুৎ হানে।

ছেলেটা বোধকরি নেহাৎই ঘায়েল হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'তাইতো! আর শাড়ীখানাও কি আপনার তেমনি অদ্ভুত। পেলেন কোথায় এই বাঘ ডোরা শাড়ী? যখন রাগ করে এখান থেকে সরে গেলেন, ঠিক যেন মনে হল একটা বাঘ চলে গেল।'

'কী, কী বললে?' মল্লিকা যেন ছিটকে ওঠে।

ছেলেটা আর একবার থতমত খেয়ে বলে, 'মানে বলছি আপনার শাড়ীর ডোরাটা ঠিক বাঘের গায়ের মত—'

'বাঘ না বাঘিনী?'

আর একটা বিদ্যুত হানে মল্লিকা। যে বিদ্যুত কটাক্ষ ছেলেটা তার এই বাইশ বছরের জীবনে কোথাও কোনদিন দেখে নি।

কোথা থেকেই বা দেখবে? নিতান্তই যে গৃহপালিত জীব এরা।

তাই এবার সে ভয় পায়। ভয়ঙ্কর এক ভয়ের রোমাঞ্চ তাকে যেমন একদিক থেকে এই দাওয়ার সঙ্গে পেরেক পুঁতে আটকে রাখতে চায়, তেমনি আর একদিক থেকে ধাক্কা মেরে তাড়াতে চায়।

শেষ অবধি জয় হয় শেষোক্তেরই।

বনকচু আর আশশ্যাওড়ার জোলো জোলো বন্য গন্ধ এদের রোমাঞ্চকে ভয় করতেই শিখিয়েছে।

অতএব 'আমি যাই' বলে উঠে দাঁড়ায় ছেলেটা।

মল্লিকা ওর ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু করুণার হাসি হাসে।

ওর মনের দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে অনেকগুলো পুরুষের নির্লজ্জ বুভুক্ষু দৃষ্টি। যে দৃষ্টি 'যাই' বলে সরে যেতে জানে না, 'খাই' বলে লাফিয়ে পড়তে আসে।

'যাও বাড়ী গিয়ে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দাও, নইলে রাতে ঘুম হবে না।' বলে আর একবার তেমনি বাচাল হাসি হেসে ওঠে মল্লিকা।

আর ও চলে যেতেই সহসা যেন একটা নিষ্ঠুর কাঠিন্যে প্রস্তরময়ী হয়ে যায়।

কী বিশ্রী, কী পানসে এখানের এই পুরুষগুলো! ছিঃ। বাইশ বছরের একটা জোয়ান ছেলের রক্ত এত ঠাণ্ডা! বাঘিনী দেখে ভয় পায়, তাকে শিকার করবার লোভে দুরন্ত হয়ে ওঠে না। হবেই তো, এরা যে গোস্বামী!

প্রভাতের শিরায় শিরায়ও এই জোলো রক্তের স্তিমিত প্রবাহ।

আর একবার খিড়কিড় দরজাটায় মৃদু শব্দ হয়।

প্রভাত এসে দাঁড়ায় একহাতে একটা ভাল পাকা পেঁপে, আর একহাতে একটা টাটকা ইলিশ মাছ নিয়ে।

পেঁপেটা সাবধানে দাওয়ার ধারে নামিয়ে রেখে বলে ওঠে 'হুড়কোটা খোলা পড়ে কেন? এই ভর সন্ধ্যেবেলা একা রয়েছ?'

মল্লিকা মুচকি হেসে বলে, 'একা বলেই তো সাহস দুর্ব্বার। মনের মানুষ ধরতে দোর খুলে রেখেছি। তা' এমন আমার কপাল যে, মনের মানুষ ধরা দিতে এসে ভয় পেয়ে পালায়।'

প্রভাত অবশ্য এই উগ্র পরিহাসটুকু নিজের সম্পর্কে প্রযোজ্য করে নিয়ে পারপাক করে ফেলতে পারে। আর পারে বলেই হেসে বলতে পারে—পালাবার আর জো কোথায়? সে তো লটকেই পড়ে আছে।... কিন্তু আজও এখনও অঙ্গে সেই বিশুদ্ধ পবিত্র শাড়ী? এত দেরী করে এলাম তবু কাজ শেষ হয় নি?'

হঠাৎ মল্লিকা একটা বেপরোয়া কাজ করে বসে। শাশুড়ীর ছুঁৎমার্গের আর বিশুদ্ধতার প্রশ্ন ভুলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে প্রভাতের গায়ের উপর প্রায় সত্যি বাঘিনীর মত। সাপের মত দুখানা হাতে

তাকে পিষে ফেলে নেশা ধরানো গলায় বলে, 'নাই বা হল কাজ শেষ। তুমি পারো না আমাকে শেষ করে দিতে?...'

'ছি ছি, এ কী!' শিউরে উঠে মল্লিকাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দেয় প্রভাত। নিজে ছিটকে পাঁচ হাত সরে গিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'মার রান্না করতে করতে মাছের ওপর এসে পড়লে? দেখো তো কী অন্যায়! যাও যাও, শাড়ীটা বদলে এসো।'

কিন্তু মল্লিকা স্বামীব এই ব্যস্ত অনুজ্ঞা পালনের দিক দিয়েও যায় না। বরং আর একবার কাছে সবে এসে তাকে দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে তীব্র কণ্ঠে বলে, 'তুমি কী, তুমি কী? তোমার দেহে কি পুরুষেব বক্ত বয় না? যে বক্তে কেন কিছুতে এতটুকু সাড়া জাগে না!'

বিমূঢ় প্রভাত কি বলত কে জানে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে প্রভাত-জননীব তীব্র তিক্ত শানানো গলা বেজে ওঠে, 'বৌমা কি দুধ চড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছ, না পাড়া বেড়াতে গেছ। দুধ পোড়া গন্ধে যে বাজ্য ভুবন ভবে গেল।'

তাবপর সেরাত্রিটা মল্লিকার কেমন করে কাটে কে জানে, কিন্তু পরদিন থেকে ভারী চুপচাপ আর শান্ত হয়ে যায় সে।

ভোব বেলা উঠে স্নান সেবে পূজোর ঘবে ঢুকে ঘর মোছে। চন্দন ঘষে রাখে, ধূপ জ্বালে, তারপব সাজি হাতে নিয়ে বাগানে যায় ফুল তুলসী তুলে আনতে।

বাগান মানে নিতান্তই অযত্ন বর্দ্ধিত খানিকটা জমি, প্রভাতের মা নিজেব প্রয়োজনে দুচারটে ফুল আর তুলসীর গাছ পুঁতেছেন। সে ফুল তুলতে তুলতে মল্লিকা ভাবে, এই বাগানটাকে আমি সুন্দর করে তুলবো, ফুল ধরাবো, রঙ ফলাবো।

আকাশে এত রং, বাতাসে এত রস, সমস্ত পরিবেশে এমন স্নিগ্ধতা এমন পবিত্রতা এ সমস্তই বিফল হবে? আমি হেরে যাবো? মল্লিকার বাবার রক্ত মাথা হেঁট করে আসর ছেড়ে চলে যাবে, জয়ী হয়ে উঠবে

মামার অন্ন ?

ছি ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী ভাবল কাল প্রভাত! ও কী মল্লিকাকে ঘৃণা না করে পারবে ?

কিন্তু তাই কি ?

কোথায় পায় তবে প্রভাত সারারাত্রি ব্যাপী অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ঘুম ? মল্লিকা যে সারারাত জেগে বসে থেকেছে, জানালার শিকে মাথা ঠুকেছে, অর্দ্ধেক রাত্রে ছাতে উঠে গিয়ে প্রেতিনীর মত দীর্ঘ ছায়া ফেলে দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, তার তো কিছুই টের পায় নি প্রভাত।

শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে আস্তে আস্তে কেমন অদ্ভুতভাবে স্তিমিত হয়ে গেছে মল্লিকা। নতুন করে সংকল্প করেছে মায়ের মত হবে।

তাই ধূপের গন্ধের মধ্যে, ফুলের গন্ধের মধ্যে, চন্দনের গন্ধের মধ্যে তার মাকে খুঁজে পেতে চায়।

করুণাময়ী হৃষ্ট হন। ভাবেন গত সন্ধ্যার অসতর্কতার অনুতাপে আর করুণাময়ীর বাঘা শাসনের ভয়ে বৌ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। হুঁঃ বাবা, কথাতেই আছে হলুদ জব্দ শিলে, আর বৌ জব্দ কীলে। তা' কীল মারা-টারার যুগ আর নেই অবিশ্যি, কিন্তু জিভের ওপর তো আর আইন বসানো যায় না ?

'কাকার একটা চিঠি এসেছে' বলল প্রভাত খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে। করুণাময়ী মুখ তুলে বললেন, 'খামে চিঠি! ব্যাপার কি ? হঠাৎ আবার কি বার্ত্তা ? কই পড় শুনি।'

প্রভাত ইতস্ততঃ করে বলে, 'ওই মানে আর কি, লিখেছেন যে আমি ওখানের চাকরীটা ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি খুবই দুঃখিত ছিলেন, তা' সম্প্রতি আবার একটা ভাল পোষ্ট হঠাৎ খালি হয়েছে, কাকা চেষ্টা করলেই হয়ে যেতে পারে। এখন আমি যদি ইচ্ছে করি—'

করুণাময়ী ছেলের কথাটা শেষ করতে দেন না, প্রায় ধেই ধেই করে ওঠেন 'বটে বটে! খুব যে আমার হিতৈষী এলেন দেখছি।

ছেলেটিকে বাড়ী ছাড়া না করলে আর চলছে না। ভেবে বুক ফেটে যাচ্ছে যে ছেলেটা মায়ের কোলের কাছটায় রয়েছে, ঘরের দুধটা মাছটা ফলটা তরকারিটা খাচ্ছে। আর কিছু নয়, এ ওই তোর কাকীর কুপরামর্শ। আমার ছেলেটা যাতে আমার কাছে না থাকতে পায়। ···সেবার অমনি বরকে পরামর্শ দিয়ে কি একটা চাকরী দিইয়ে সেই ছুতোয় নিয়ে গল। বোনঝির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একেবারে 'নয়' করে নেবার তাল ছিল, তা' সে গুড়ে বালি পড়েছে। তবু আবারও এখন চেষ্টা করছে কি করে মার কাছ থেকে ছেলেটাকে আবার নিয়ে—'

প্রভাত ব্যাকুলভাবে বলে, 'আচ্ছা মা কি বলছ যা তা?'

'যা তা মানে? মিথ্যে বলছি আমি? ও যে কত বড় জাঁহাবাজ মেয়ে, তার কিছুই জানিস তুই? তোর বড় বৌদি মেজ বৌদিকে কুমতলব দিয়ে ভেন্ন করাল কে? এক একবার পূজোর সময় কি ছুটি ছাটায় এসেছে, নিজের স্বাধীন সংসারের গল্প করে করে ওদের মন মেজাজ বিগড়ে দিয়ে গেছে। তা'তেও আশ মিটল না, এখন শেষ চেষ্টা তোকে যাতে—'

'আচ্ছা মা মিথ্যে একটা মানুষকে দোষী করছো কেন? আমি বলছি এটা সম্পূর্ণ কাকার ব্যাপাব। কাকাই লিখেছেন—'

'কী লিখছে তাই শুনি ভাল করে। পড়তো দেখি—'

কিন্তু প্রভাত পড়ে না। অর্থাৎ পড়তে পারে না। এ চিঠির মধ্যে গলদ আছে। তাই চিঠিটা হাতের মধ্যেই রেখে বলে, 'ওই তো বললাম। দোষনীয় কিছু নেই বাপু।'

'বলি পড়ে যা না তুই। দুষ্য কিছু আছে কি না, সে তুই কি বুঝবি। ধরবার বুদ্ধি তোদের আছে? না বোঝবারই চোখে তোদের আছে? পড় আমি শুনি।'

করুণময়ী 'দুষ্য' আবিষ্কারের চেষ্টা আর একাগ্রতা নিয়ে অবহিত হয়ে বসেন।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে প্রভাতের। এ চিঠি গড়গড় করে পড়ে গেলে, করুণাময়ী রসাতল করে ছাড়বেন। এক আসামীকে ছেড়ে, ধরবেন

আর এক আসামীকে। তাই কখনো যা না করে তাই করে বসে। মিথ্যে কথা বলে মাকে।

'এ চিঠির কোনখানেই বা পড়ে শোনাব তোমাকে? তিনভাগই তো ইংরিজি। মোটকথাটা ওই যা বললাম।'

একটু ইতস্ততঃ করে, 'যাই দাড়িটা কামিয়ে আসি,' বলে গালে হাত বুলোতে বুলোতে সরে পড়ে সে মার কাছ থেকে।

করুণাময়ী ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, 'তুই আজ মিথ্যে কথা বললি আমায়। আমি তোর মুখ চোখ দেখে বুঝি না? হবেই তো, কোন না কোন হাভাতের ঘরের একটা মেয়ে এনে মাথার ওপর বসিয়েছিস, এখন স্বভাব বিগড়োবে এ আর বিচিত্র কি।'

বৌকে অবশ্য তিনিও শেষ পর্যন্ত দ্বিধা ত্যাগ করে বরণ করে তুলেছিলেন, গ্রহণ করে নিয়েছেন, কিন্তু সে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে। ছেলে যখন কাজটা প্রায় সমাধা করেই বসেছে, তখন আর আপত্তি দেখিয়ে ধাষ্টমো করে লাভ কি।

তবে একটু প্রসন্নতা ছিল এই কারণে, মেজবৌটার বড় রূপের গরব ছিল, সে গরব ভাঙবার অস্তর নিয়ে ঢুকেছিল ছোট বৌটা। তা'ছাড়া নিজের ছোট জায়ের থোঁতা মুখটা ভোঁতা হল তো?

মল্লিকাকে করুণাময়ী সুচক্ষেই দেখেন। বিশেষ করে যখন মল্লিকা বরটিকে নিয়ে 'বাসায় যাবার' কুমতলবটি না করে উল্টে বরং বাসায় না যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে প্রভাতকে কলকাতায় থাকার প্ররোচনা দিল, তখন থেকে আরো সুনজরে দেখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ক'দিন থেকে কেমন বিগড়ে গেছে বৌটা!

আর কিছুই নয়, নিশ্চয় ওই জায়েরা তলায় তলায় ফুসলেছে। 'ভেন্ন' হাঁড়িই করেছে ওরা, বাড়িতে আসাটি তো ছাড়ে নি। 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো' করে রঙ্গরসটিও কমতি নেই কিছু। ইচ্ছে হয় যে ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে যাক, এদিকে আসা বন্ধ হোক, নেহাৎ ওই নিজের পেটের ছেলে দুটোর জন্যেই মায়া। তবু তো আসে বসে কথা কয়।

না, নতুন বৌটাকে—এবার একটু কড়া নজরে রাখতে হবে। যাতে

ওদের সঙ্গে বেশী মিশতে না পারে। বৌটা একটু খামখেয়ালি আছে। হয়তো একদিন দেখো ভোর রাত্তিরে উঠে চান করেছে, ফুল তুলেছে, চন্দন ঘসেছে, পূজোর গোছ করেছে, রান্নাঘরে গিয়ে কুটনোটি বাটনাটি করতে লেগেছে। ওমা আবার একদিন দেখ, না চান—না কিছু সক্কাল বেলা থেকে ছাতে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কোন জগতের মানুষ।··· কিন্তু না ওই কুপরামর্শ। যাই হোক প্রভাতকে আর তিনি খুড়ো খুড়ির কবলে পড়তে যেতে দিচ্ছেন না। হোক না এখানে মাইনে কম, ঘরের ভাত খেয়ে থেকে যতটি জমবে, বাইরে গিয়ে তার ডবল মাইনে পেলেও কি তা' জমবে? ভাবলেন এই যুক্তিতেই তিনি ছেলেকে কাৎ করবেন। বৌটা তাঁর দলে এই যা ভরসা। একা বাসায় যেতে চায় না।

বুকের বল নিয়ে পাড়ায় বান্ধবীদের উদ্দেশে যাত্রা করেন করুণাময়ী রান্নাঘরের দরজাটায় ছেকলা টেনে দিয়ে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে আলোচনা চলছিল উল্টো।

প্রভাত ঘরে ঢুকে নীচু গলায় মল্লিকাকে যে প্রশ্ন করে, সে প্রশ্নে আহত বিস্ময়ের সুর। 'তুমি আমার কাকীমাকে চিঠি দিয়েছিলে?'

মল্লিকা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীর ছোট জানালা। যার মধ্যে দিয়ে আকাশ ধরা পড়ে না, দৃষ্টি ব্যাহত হয় ঝোপ জঙ্গলে গাছপালায়। তবু জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা যখনই সময় পায়।

প্রভাতের প্রশ্নে, ফিরে না তাকিয়েই বলে, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য্য, কই বলনি তো?'

'কাউকে একটা চিঠি দিলে সে কথা বলতে হয় তা' জানতাম না।'

'এভাবে বলছ কেন? ছিঃ।'

মল্লিকা নীরব।

'রাগ করছ? কিন্তু ভেবে দেখ, আমার কি—আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দিল্লী যাবার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলে তুমিই বেশী। অথচ —তুমি কাকীমাকে জানিয়েছ বাইরে আমার জন্যে কাজ দেখতে, এটা

একটা ধাঁধাঁ নয় কি ?'

হঠাৎ জানালা থেকে সরে আসে মল্লিকা। এসে দাঁড়ায় প্রভাতের একেবারে নিতান্ত কাছে। রহস্যময় একটু হাসি হেসে বলে, 'ধাঁধাঁ বলে ধাঁধাঁ ? একেবারে ধাঁধাঁ।'

ওই রহস্যের ঝিলিক লাগানো চোখ মুখ দেখে কে পারে মাথার ঠিক রাখতে। আর যেই পারুক অন্ততঃ প্রভাত পারে না। তাই বিগলিত আদরে বলে, 'মর্ত্যবাসী অধম জীব, 'গোলক' তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা কোথায় ? সত্যি বল না, হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন ? কাকীমাকে তো চেনও না, বাসার ঠিকানাই বা জানলে কি করে ?'

মল্লিকা মুচকে হেসে বলে, 'ও আর জানা কি ? চিঠি চুরি করে ঠিকানা যোগাড় এ সব তো আমার নিত্যকর্ম ছিল। এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে ঢুকেছি যে, যে লোক ঘরে জেগে বসে থেকেছে, সেও—' ঝোঁকের মাথায় বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় মল্লিকা। শুধু একটু হাসে। ওর সেই হাসির মধ্যে ধরা পড়ে একখানি অতীতে ঘুরে বেড়ান মন। এখানে বসে আছে মল্লিকা, তবু যেন এখানে নেই।

প্রভাত ওর সেই অনুপস্থিতি মনের ছায়া ফেলা মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বলে, 'এসব কথা তুমি আব বোলো না মল্লিকা। শুনতে বড় কষ্ট লাগে। আমার তো এখন আব কিছুতেই বিশ্বাস হয় না সেই 'আরাম কুঞ্জ'ব সঙ্গে কখনো কোনও যোগ ছিল তোমার।··· কী অপূর্ব লাগে যখন তুমি চেলির শাড়ী পরে লক্ষ্মীর ঘরে আলপনা দাও, তুলসী তলায় প্রদীপ দাও, মায়েব রান্নার যোগাড় করে দাও, কি মিষ্টি লাগে যখন তুমি ঘরকন্নার খুঁটিনাটি কাজে ঘুরে বেড়াও মাথায় ঘোমটা দিয়ে। এ বাড়াতে তুমি কখনো ছিলে না ভাবতে ইচ্ছে করে না। ভাবতে গেলে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা হয় তুমি একটা সেই বিশ্রী কুৎসিত পরিবেশে ছিলে—'

মল্লিকা ওর দিকে তীক্ষ্ণ কুটিল একটা দৃষ্টি ফেলে বলে, 'যন্ত্রণা হয়, না ঘৃণা হয় ?'

'ঘৃণা! না মল্লিকা ঘৃণা হয় না।'

'হয় না ?'

'নাঃ। তা' যদি হতো, তখনই হতো। তা'হলে তোমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার রান্নাঘরে, চিরদিনের গৃহদেবতার ঘরে এনে তুলতে পারতাম না।'

মল্লিকা আর একটু তীক্ষ্ণ হয়, 'সে তখন নতুন নেশার মোহে—'

'ভুল করছ মল্লিকা, নেশাও নয়, মোহও নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস সেটা—'

'তবে বোধ করি দয়া, করুণা।'

'নিজেকে ছোট করবার জন্যে এই চেষ্টার পাগলামী কেন তোমার মল্লিকা ?'

'ছোট করবার চেষ্টা নয়, সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করবার চেষ্টা। আর সে সত্যকে সহ্য করবার শক্তি আমার আছে। তুমি আমাকে দেখে করুণায় বিগলিত হয়ে আমার ভার গ্রহণ করলে, এটা তোমার নিজের মনের কাছে সাফাই হতে পারে, আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি বলবো, তুমি রূপ-নেশাগ্রস্ত হয়ে—'

'মল্লিকা ! আমরা এখন ভদ্রঘরের স্বামী স্ত্রী।'

'ওঃ ! আচ্ছা। খোলাখুলি কথা কওয়া তো এ সমাজে অচল ! কিন্তু না জিগ্যেস করে পারছি না, আমি যদি মামার একটা হাড় কুচ্ছিত হাড় মুখ্যু ভাগ্নী হতাম ?'

'কী হলে কী হত, সে উত্তর দেওয়া অর্থহীন মল্লিকা ! মানুষ যে কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজ করে অথবা করতে পারে, আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। তবু আমাকে যদি 'রূপ মুগ্ধ পতঙ্গ' বলে অভিহিত কর সেটা তোমার আমার প্রতি নিতান্ত অবিচার হবে।'

'কেন ! কেন ! কেনই বা তা হবে না তুমি ?' হঠাৎ দু'খানা সর্পিল হাত বেষ্টন করে ধরে প্রভাতকে, পিষ্ট করে ফেলতে চায় যেন, 'কেন তুমি এত বেশী জোলো হবে ? আমার রূপটা বুঝি তুচ্ছ করার মত ? এতে মুগ্ধ হওয়ায় অগৌরব ?'

'উঃ, উঃ, ছাড় ছাড়, লাগে।' প্রভাত হেসে ফেলে। হেসে

বলে, 'পাহাড়ে মেয়ের আদরও পাহাড়ে। স্বীকার করছি বাবা, এ হতভাগ্য ওই রূপের অনলে একেবারে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ; এখন তার বাকীটুকু আর চোখের অনলে ভস্ম করে ফেলো না।'

মল্লিকা হাত দুখানাকে কোলের ওপর জড় করে সহসা স্থির হয়ে যায়। স্তিমিত গলায় বলে, 'অপমান করলেই করবো হয়তো।'

'অপমান?'

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু মল্লিকা—'

'কিন্তু টিন্তু জানি না। কিসে মান কিসে অপমান সে বোধ তোমার থাকলে তো? আশ্চর্য্য, তুমি যে কেন এত বেশী ঠাণ্ডা! তোমার দাদারা তো—

'কি আমার দাদারা?'

'কিছু না।'

'বাঃ আধখানা বলে রেখে আধকপালে ধরিয়ে দিতে চাও?'

'না, তা চাই না! বলছিলাম তোমার দাদাদের তো বেশ প্রাণ-শক্তি আছে—'

'রাতদিন বৌদিদের সঙ্গে ঝগড়া চলে বলে? তা যদি হয়, স্বীকার করছি আমার প্রাণশক্তির অভাব আছে।'

'কিন্তু ঝগড়া জিনিসটা খারাপ নয়।'

'খারাপ নয়!'

'না। ওতে ভিতরের বদ্ধ বাতাস মুক্তি পায়। মনের মধ্যে তিল তিল করে যে অভিযোগ জমে ওঠে, তাকে বেরোবার পথ দেওয়া হয়।'

'যা দেখছি ও বাড়ীর জ্যেঠিমার মত পাড়াকুঁদুলি নামটি আহরণ না করে ছাড়বে না তুমি। যাক আমাকে একটু খেতে পরতে দিলেই হল। তোমার গৃহে গৃহপালিত পোষ্য হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আগের কথাটায় ফিরে আসা যাক, তুমি চিঠিতে কাকীমাকে অনুরোধ করেছ আমাকে আবার ওদিকে একটা চাকরী করে দিতে?' প্রভাতের চোখে গভীরতা।

মল্লিকা সেই গভীর দৃষ্টির দিকে নির্নিমেষে দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে বলে, 'করেছিলাম!'

'কেন বল তো? তুমি তো তা' চাওনি—'

'যদি বলি, তখন চাইনি, এখন চাইছি।'

'কিন্তু কেন? বাংলা দেশের জল হাওয়া আর ভাল লাগছে না? না, সহ্য হচ্ছে না?'

মল্লিকা প্রভাতের এই সহজ প্রশ্নটুকুতেই কেমন কেঁপে ওঠে। কোথায় যেন ভয়ানক একটা ব্যাকুলতা। কণ্ঠেও সেই ব্যাকুল সুর ফোটে, 'আমি বুঝি শুধু আমার কথাই ভেবেছি? শুধু আমার জন্যেই বলছি? আমার অহেতুক একটা তুচ্ছ ভয়ের জন্যে তোমার কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝি আমাকে কষ্ট দেয় না?'

'এই কথা!'

প্রভাত যেন অকূল সমুদ্রে কূল পায়। অন্ধকারে আলো পায়।

'এই কথা। এই ভেবে তুমি মাথা খারাপ করছ? আর আমি যদি বলি কেরিয়ার নষ্টটা তোমার মনের ভ্রম। আমি যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি, আমি যা পেয়েছি, যাতে আছি, তাতেই সুখী যদি হই, তা'হলে কে নষ্ট করতে পারে আমার ভবিষ্যৎ? ওই বাজে কথাটা ভেবে তুমি মন খারাপ কোর না মল্লিকা। নাই বা হলো আমাদের জীবন-কাব্যের মলাটটা খুব রংচঙে 'গর্জ্জাস', ভিতরের কবিতায় থাকুক ছন্দের লালিত্য, ভাবের মাধুর্য্য। আর সে থাকা তো আমাদের নিজেদেরই হাতে, তাই নয় কি মল্লিকা? আমার বাবা আমার দাদারা যে ভাবে জীবনটা কাটিয়ে গেলেন, কাটিয়ে আসছেন সুখ দুঃখের ছোট্ট নৌকাখানি বেয়ে, আমরাও যদি তেমনি ভাবে কাটিয়ে যাই ক্ষতি কি? তুমি পারবে না মল্লিকা আমার মা ঠাকুমার মত জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে?'

মল্লিকা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওর চোখে জল আসে। মল্লিকা সেই জলভরা দুই চোখ তুলে বলে, 'পারবো।'

পিছিয়ে যেতে হল ফেলে আসা দিনে, ফিরে যেতে হ'ল বাংলা

থেকে পালাবে।

'গণশা! হারামজাদা, পাজী।

চাটুয্যে দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে তেড়ে আসেন গণেশের চুল ছিঁড়তে।

'তোর ষড়যন্ত্র না থাকলে এ কাজ হতেই পারে না। বল হারামজাদা শয়তান, কোথায় গেছে তারা?'

গণেশ নির্বিকারের সাধক।

সে মাথা বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে গম্ভীর গলায় বলে, 'কোথায় গেছে, সে কথা জানলে কি আর আপনাকে প্রশ্ন করতে আসতে হতো বাবু? নিজে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসতাম।'

'বিচ্ছু শয়তান! স্টুপিড্! চালাকি খেলে আমার সঙ্গে পার পাবি? 'বাঘা' আর 'হায়েনা' কে যদি তোর ওপর লেলিয়ে দিই?'

'ইচ্ছে হয় দিন।'

'কবুল না করলে ওরা তোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে তা জানিস?'

'তা আর জানবো না কেন বাবু? দেখলাম তো অনেক।'

'চুপ! নোংরা ছুঁচো ইঁদুর শুয়োর গাধার বাচ্চা—'

'বাচ্চা টাচ্চা বলবেন না বাবু, মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না।'

'মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না? হারামজাদা শালা! আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারছি আমি, আর তুমি—'

'ঠিক আর রাখছেন কোথায় বাবু? মেজাজ তো আকাশে চড়াচ্ছেন!'

'চড়াব না? তুই বলিস কিরে বদমাস! রাতারাতি সাতকৌটোর মাঝ কৌটোয় ভরা রাজপুরীর প্রাণপাখীটুকু উড়ে গেল, আর আমি চুপ করে থাকবো?'

'বাবু তো বেশ ভাল ভাল বাক্যি কইতে পারেন। সে—ই কবে ঠাকুমার কাছ থেকে ওই সব সোনার কাঠি সোনার কৌটোর গল্প শুনেছি—'

'গণশা? তোকে আমি খুন করবো। ন্যাকরা করছিস আমার সঙ্গে? আর সময় পেলি না ন্যাকরা করার? বল লক্ষ্মীছাড়া পাজী, দিদিমণি গেল কোথায়?'

'সেই পুরনো উত্তুরই দিতে হবে বাবু!'

'লাঠি, লাঠি চাই একটা গণশা, নিয়ে আয় শাগগির! তোর মাথাটা ফাটিয়ে তবে আজ আমি জলগ্রহণ করবো—'

গণেশ দ্রুত অন্তর্হিত হয়, এবং মুহূর্তের মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে এসে মনিবের হাতে তুলে দেয়।

চাটুয্যে অবশ্য সেইটুকু সময়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছেন, লাঠিটা কেন চেয়েছিলেন। বলে ওঠেন 'কী হবে?'

'ওই যে বলেছিলেন মাথা ফাটাবেন—'

'ওরে বজ্জাত! সমানে তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি চালিয়ে যাচ্ছিস? শেষ কালে কী রাগের মাথায় সত্যিই একটা খুনোখুনি করে বসবো? দেখতে পাচ্ছিস না মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্বলছে! সেই গোস্বামীটাকে যদি এখন হাতে পেতাম—'

গণেশ উদাস মুখে বলে, 'তেনার আর দোষ কি?'

'দোষ নেই? তার দোষ নেই? তবে কি ট্যাণ্ডনটা—'

'আহা হা, রাম রাম! তা' কেন? ট্যাণ্ডন ম্যাণ্ডন নায়ার ফায়ার, ওনারা সকলেই মহৎ চরিত্তিরের লোক। পরস্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকান না, তা ফুসলে বার করে নিয়ে যাওয়া—'

'গণশা! কার কাছে টাকা খেয়েছিস তুই, তাই বল আমায়।'

'টাকা! ছিঃ! বাবু, ছি ছি। ওই ছোট কথাটা মুখ দিয়ে বার করতে আপনার লজ্জা লাগল না? গণশা যদি টাকা খেয়ে বেইমানি করার মতন ছুঁচো বেক্তি হতো আরাম কুঞ্জের একখানা ইঁটও গেড়ে থাকত এখানে? পুলিশের টিকটিকি এসে কেতা কেতা নোট নিয়ে—'

গণেশ সহসা চুপ করে যায়। আত্মগরিমা করা তা'র নীতি বিরুদ্ধে।

চাটুয্যে নরম হন। বিনীত গলায় বলেন, 'তা কি আর জানি নে রে বাপ। তোর গুণেই তো বেঁচে আছি। কিন্তু যা কাণ্ড ঘটে গেল,

তা'তে তো আর মাথা ফাতা ঠিক থাকে না। বল দিকি সেই গোঁসাই পাজীটাকে কি করে কুকুরে খাওয়াই?'

'শুধু পরের ছেলের ওপর গোঁসা করে কী হবে বাবু? ঘরের মেয়ের ব্যাভারটাও ভাবুন? নেমক যে খায়নি, তার তো আর নেমক হারামীর দোষ অর্শায় না? কিন্তু নেমক খেয়ে খেয়ে যে হাতীটি হল? দিদি বাবু যা করল—'

চাটুয্যে বসে পড়ে অসহায় কণ্ঠে বলে, 'আচ্ছা গণেশ, বল দিকি কি করে করল? আমি তাকে সেই এতটুকু বয়েস থেকে লাললাম পাললাম, লেখাপড়া শেখালাম, কেতা কানুন শেখালাম, আর সে আমার মুখে জুতো মেরে—'

গণেশ নির্লিপ্ত স্বরে বলে, 'সবই করেছিলেন বাবু, শুধু একটা কাজ করতে ভুলে গেছলেন। মানুষটা করেন নি। লেলেছেন পেলেছেন, সবই ঠিক, ওই মানুষটা করে তুলতে বাকী থেকে গেছে। মানুষ করলে কি আর নেমকহারামীটা—'

'দেখ গণশা।—এমন ভাবে এক কথায় হারিয়ে যেতে তাকে আমি দেব না। যে করে হোক খুঁজে তাকে আনতেই হবে।'

'তা তো হবেই বাবু। নইলে তো আপনার 'আরামকুঞ্জ'র ব্যবসাটাই লাটে ওঠে।'

চাটুয্যে সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'গণশা তোর কথাবার্ত্তা গুলোতো সুচাকের নয়। কেমন যেন ভ্যাঙচানি ভ্যাঙচানি সুরে কথা কইচিস মনে হচ্ছে।'

'কী যে বলেন বাবু।'

'তবে শোন। সোজা হয়ে কথার জবাব দে। কাল কখন সেই হারমজাদার ব্যাটা হারামজাদাকে শেষ দেখেছিলি?'

'আজ্ঞে রাতে খাওয়ার সময়।'

'আর মল্লিকাকে?'

'আজ্ঞে তার ঘণ্টা দুই পরে। রান্নাঘর মেটানর সময়।'

'তারপর? কখন সেই শয়তান দুটো একত্র হয়ে—কেষ্ট টের

পেল না ?'

'আজ্ঞে নরলোকের কেউ টের পেলে তো আর তাঁদেরকে স্বর্গলোকে পৌঁছতে হত না ?'

'তুই ভোরে উঠে খোঁজ করেছিলি ?'

গণেশ ঈষৎ মাথা চুলকে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে 'আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে হলে, খোঁজ একবার মাঝরাত্তিরেই করতে হয়েছেল।'

'তার মানে ?'

'তার মানে আজ্ঞে জানেন তো সব। পাপ মুখে আর কবুল করাচ্ছেন কেন ? যেই মাঝ রাত্তিরে ওই আপনার নায়ার সাহেবের হঠাৎ পিপাসা পেয়ে গেল, আমাকে ডেকে অর্ডার করলেন মিস সাহেবকে দিয়ে এক গেলাশ জল পাঠিয়ে দিতে, তা' আমি খোঁজ করে গিয়ে বললাম, হবে না সাহেব। পাখী বাসায় নেই। বোধ করি অন্য ডালে গিয়ে বসেছে—'

চাটুজ্যে হঠাৎ দু'হাতে গণেশের কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'শালা পাজী, তক্ষুণি আমাকে এসে খবর দিলি নে কেন ?'

গণেশ নির্বাক, নিষ্কম্প।

'আজ্ঞে সে রেওয়াজ তো নেই।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, এর মূলে তোর হাত আছে। তোর সাহায্য না পেলে—'

'এ সন্দেহ তো বাবু আপনার সঙ্গের সাথী। শুধু আপনার কেন আদি অন্তকালের পৃথিবীতে আপনার মত তাবৎ মহাপুরুষেরই এই অব্যেস। যার কাছে বিশ্বাস, তাকেই সব থেকে অবিশ্বাস।'

'আচ্ছা গণশা! এই দুঃসময়ে তুই আমার কথার দোষ ত্রুটি ধরছিস ? বুঝছিস না আমার প্রাণের মধ্যে কী আগুন জ্বলছে। মল্লিকা আমার সঙ্গে এই করল।'

'আজ্ঞে এই তো দুনিয়ার নিয়ম।'

'আচ্ছা আমিও দেখে নেব। সেই বা কেমন চীজ্ আর আমিই বা কেমন চীজ্। সেই গোঁসাইটাকে ধরে এনে যদি মল্লিকার সামনে

টুকরো টুকরে করে না কাটতে পারি।—'

'বাবু খপ্ করে অত সব দিব্যি-টিব্যি গেলে বসবেন না এই ভারত খানা তো আপনার হাতের চেটো নয়?'

'নয় কি হয় তা' দেখাবো। তবে তুই বদমাস যদি বিপক্ষে ষড়যন্ত্র না করিস্—'

'আজ্ঞে আবার বেমাত্রা হচ্ছেন বাবু। বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করতে শিখলে এর অনেক আগে মিস সাহেব পাচার হয়ে যেতে পারতো। ওই আপনার গিয়ে নেমকহারামীটির ভয়ে ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্যি মায়া দয়া, মানুষ মনুষ্যত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছি!'

'গণেশরে! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে!'

'তা একটুক্ষণ নয় কাঁদুন! ভেতরের গ্যাসটা খোলসা হোক।'

'তোর কি মনে হয় বলতো? মল্লিকাকে আর পাওয়া যাবে না?'

'এ দুনিয়ায় অসম্ভব সম্ভব হলে, কি না হতে পারে?'

চাটুয্যে মিনিট দুই গুম্ হয়ে থেকে বলে, 'হাঁ, হায়েনাটাকে একবার ঘর থেকে বার করে আন দিকি, আর—আচ্ছা, আর শোন কাগে-বগে যেন টেরটা না পায় এখন—'

'আজ্ঞে টের পেতে তো বাকীও নেই আর কেউ। কে না জেনেছে?'

'জেনেছে? আঃ! সবাই জেনে ফেলেছে?

'আজ্ঞে নিয্যস!'

চাটুয্যে মাথার চুল মুঠোয় চেপে বলে, 'এইবার যাবে আরাম কুঞ্জ। শেষ হয়ে যাবে। আরাম কুঞ্জর প্রাণপাখীই যখন উড়ে গেল।'

গণেশ নিজস্ব স্টাইলে বলে, 'আজ্ঞে মনে করে মায়া দয়া বলে জিনিসগুলো বাক্স থেকে বার করব না। তবু কেমন এসে পড়ে। তাতেই বলছি, না উড়েই বা করবে কি? পাখীর প্রাণ বৈ তো নয়? হাতী পুষতে যদি কেউ পাখীর মাংসর ওপর ভরসা রাখে—'

'কী বললি? কী বললি পাজী?'

'কিছু না বাবু কিছু না।'

'হুঁ। বুঝেছি, তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকে চাটুয্যে।

তারপর স্মৃতির ভেলায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় অনেক দূরসমুদ্রে। সেই তার ছোট বোনটা। মল্লিকার মা। লক্ষ্মী প্রতিমার মত মূর্তিটি। মল্লিকা কি তার মত হতে চায়? আর মল্লিকা যা চায়, তাই তবে হতে দেবে চাটুয্যে!

এই আরাম কুঞ্জের পাট চুকিয়ে চাটি বাটি গুটিয়ে ফিরে যাবে সেই দূর ঘাটে? যে ঘাট থেকে একদিন নৌকোর রশি কেটে দরিয়ায় ভেসেছিল। আর ভাসতে ভাসতে পাঞ্জাব সীমান্তের এই পাহাড়ে বরাত ঠুকে—বরাত ফিরিয়েছিল।

'আরাম কুঞ্জ'র কুঞ্জ ভেঙে দিয়ে পয়সা কড়ি গুটিয়ে নিয়ে চাটুয্যে যদি জন্মভূমিতে ফিরে যায়, করে খেতে তো আর হবে না তাকে এ জীবনে?

মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে চাটুয্যের। সত্যি হয়না আর তা?

কিন্তু কেনই বা হবে না? আর বেশী টাকার কি দরকার তার? না বৌ না ছেলে। না ভাই, না বন্ধু! একটা পুষ্যি ছিল, তা সেটাও শিকলি কেটে হাওয়া হল। কার জন্যে তবে কি? অনেক পাপ তো করা হল, বাকী জীবনটা ধর্ম কর্ম করে—

হঠাৎ নিজের মনে হেসে ওঠে চাটুয্যে। ক্ষেপে গেল না কি সে? তাই বিড়াল তপস্বী হবার বাসনা জাগল? একেই বুঝি শ্মশান বৈরাগ্য বলে।

উঠে পড়ল।

পরামর্শ করতে গেল প্রিয় বান্ধব ট্যাণ্ডন আর নায়ারের সঙ্গে।

একত্রে নয়, আলাদা আলাদা। বিশ্বাস সে কাউকে করে না। কে বলতে পারে ওদের মধ্যেই কেউ 'মল্লিকা হরণে'র নায়ক কি না।

চাটুয্যে শুধু সেই কবি কবি বাঙালী ছোঁড়াটাকেই সন্দেহ করছে। ও ছোঁড়াগুলোর ভালবাসাবাসির ন্যাকরাই জানা আছে, আর কোনও ক্ষমতা আছে?

এমনও তো হতে পারে, প্রভাত গোস্বামী মল্লিকাকে সরায় নি। প্রভাত গোস্বামীকেই কেউ ইহলোক থেকে সরিয়ে ফেলে মল্লিকাকে সরিয়েছে। আর সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে, তার জন্যে এইখানেই নিরীহ সেজে বসে আছে।

গণশা অত লম্বা চওড়া কথা কয়। কে জানে সেটাও ছিল কি না। টাকার কাছে আবার নেমক! মোটা টাকা ঘুষ পেয়ে লোকে নিজের স্ত্রী কন্যেকে বেচে দিচ্ছে, তো এ কোন ছার!

মনিবের ঘরের মেয়ে! ভারী তো!

ট্যাগুন নায়ার আর বাসনধোয়া দাইটা তিন জনকেই বাজিয়ে দেখতে হবে। তারপরে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। হারিয়ে গেলে বলে হারিয়ে যেতে দেবে 'মল্লিকা' নামক ঐশ্বর্য্যটিকে? তাই কখনো হয়?

উঁকি মারল গিয়ে ট্যাগুনের ঘরে। বোতল নিয়ে বসেছিল সে। সাড়া পেয়ে মৃদু হাস্যে বলল, 'আইয়ে জী।'

হাসুক!

বিশ্বাস কেউ কাউকে করে না। চোরা চালানের আর চোরাই মালের ব্যবসা করে করে ওদের কাছে গোটা পৃথিবীটাই চোর।

তাই এরা যাদের সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করে, তাদেরই ধাপ্পা দেয়, যাদের দিয়ে গোপন কাজ করায়, তাদের ওপরই আবার চড় বসায়। তাই চ্যাটার্জি যখন মেয়ে চুরির কাহিনী শুনিয়ে হাহাকার করে, ওরা তখন ভাবে, ধড়িবাজ বটে বুড়োটা, নিজেই কোন কারণে সরিয়ে ফেলে, এখন লোক দেখিয়ে আক্ষেপের অভিনয় করছে।...খুব সম্ভব কোনও কাপ্তেন মার্কা বড়লোকের খপ্পরে চালান করেছে।

তবু খোঁজবার প্রতিশ্রুতি সকলেই দেয়। শুধু নায়ার আর ট্যাগুন নয়, আরও যারা ছিল খদ্দের। জেনেছে তো সকলেই। কেউ আকাশ থেকে পড়েছে, কেউ বিজ্ঞের হাসি হেসেছে। চ্যাটার্জির মতন ঘুঘু ব্যক্তির চোখ এড়িয়ে তার ভাগ্নী হাওয়া হল, এ কী বিশ্বাসযোগ্য কথা?

কিন্তু পুরো অবিশ্বাস করাও তো চলছে না, মোটা টাকা 'খরচা'

করাচ্ছে চ্যাটার্জি উড়ে যাওয়া পাখী ধরে আনতে।

পুলিশে খবর দেবার উপায় তো আর নেই। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল কে মাবে? তা ওরা গোয়েন্দা পুলিশের বাবা। যাদের নিয়ে কারবার চ্যাটার্জীর, যারা তার 'আরাম কুঞ্জে'র চিরকালের খদ্দের।

সামান্য যে কালো মেঘটুকু মাঝে মাঝে ছায়া ফেলছিল সেটুকু বুঝি মুছে গেছে। মল্লিকা যেন মূর্তিমন্ত কল্যাণী। ঘরের কাজের পটুতা তার অসামান্য, তার উপর আছে শিল্প রুচি, সৌন্দর্য্য বোধ। সমস্ত সংসারটির উপর সেই রুচির আলপনা এঁকেছে সে।

অবশ্য প্রথম প্রথম যখন মল্লিকা সখ করে ঘরে ঝুলিয়েছিল নতুন ধানের শীষের গোছা, দালানের কোণে কোণে চৌকী পেতে 'চিত্র' করা ঘট বসিয়ে, তার মধ্যে বসিয়েছিল কাশফুলের ঝাড়, সংসারেরই এখান ওখান থেকে তামা পিতলের ছোট ছোট ঘটি সংগ্রহ করে তাদের ফুলদানী বানিয়ে ঘরে ঘরে নিত্য রাখতে অভ্যাস করেছিল ফুলের মেলা, তখন তার জায়েরা ননদ সম্পর্কীয়রা আর পড়শীনিরা মুখে আঁচল দিয়ে হেসেছিল, এবং করুণাময়ী বিরসমুখে বলেছিলেন, 'সময় নষ্ট করে কী ছেলেমানুষী কর ছোট বৌমা? অবসর সময়ে গেবস্থর তোলা কাজগুলো করলেও তো হয়।'

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যারা হেসেছিল, তাদের ঘরেই মল্লিকার অনুকরণ। তারা নিজেরা না করুক, তাদের মেয়ে টেয়েরা লুফে নিচ্ছে এই সৌখিনতা।

কিন্তু এ সব কি মল্লিকা তার মামার আশ্রয় থেকে শিখেছিল? যেখানে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বাঘের গর্জন কানে আসে? সেখানে ফুল কোথা? লতা কোথা? কোথায় বা সবুজের সমারোহ? ছিল না।

কিন্তু মল্লিকার ছিল সৌন্দর্য্যানুভূতি, আর এখানে এসে সৃষ্টি হ'ল একটি মন। গ্রামে ঘরে যে সব সুন্দর বস্তু অবহেলিত, মল্লিকার তৃষিত চোখে তা অভিনব, অপূর্ব। তাই ওর ফুলদানীতে ফুলের গা ঘিরে ঠাঁই পায় সজনে পাতা, তেঁতুল পাতা। চাল-কুমড়োকে মাথায় তুলে এতাবৎ

যে বাঁশের মাচাটা হাড়বার করা দেহখানা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের কোণে, মল্লিকা তার হাড় ঢেকে দেয় মালতি লতা দিয়ে। মাচাটা হয়ে ওঠে কুঞ্জবন। গোবর লেপা উঠোনে আলপনা আঁকে পদ্মলতা শঙ্খলতায়। সন্ধ্যায় সেখানে মাটির পিলসুজে প্রদীপ রাখে। জীবনের মোড় ঘোরাতে চাইলে বুঝি এমনি করেই সাধনা করতে ইচ্ছে হয়।

তা সাধনায় বোধ করি সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছে মল্লিকা। মাঝখানে কিছুদিন যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল সে চাঞ্চল্যকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে সত্যিই সে তার মায়ের মত শ্বাশুড়ীর মত পিতামহীদের মত হচ্ছে।

'—বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী ব্যস্ত আছ নিত্য গৃহ কাজে।
বাইরে তোমার আম্র শাখে,
স্নিগ্ধ রবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি—'

'য্যাঃ। অসভ্য!' মল্লিকা চকিত কটাক্ষে হেসে ফেলে। হেসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শ্বাশুড়ী বাড়ীতে আছেন কি না। না নেই, বাড়ীতে তিনি কমই থাকেন। পাড়া বেড়ানো, গঙ্গাস্নান, পাঠবাড়ী ইত্যাদি নানা কর্মের স্রোতে বেড়ান তিনি। আসল কথা দুই ছেলে বৌ আলাদা হয়ে যাওয়ার পর প্রভাতও যখন বিদেশে চলে গেল, শূন্য ঘর আর শূন্য হৃদয় করুণাময়ী হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন বাইরের হিজিবিজির মধ্যে।

এখন ঘরের শূন্যতা ঘুচেছে, হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচেছে, কিন্তু অভ্যাসটা ঘুচছে না। তাছাড়া এখন আবার গৃহকর্মের অনেক ভার মল্লিকা নিয়েছে। তাই তিনি মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়ান। তবে মল্লিকার ওপর চোখ রাখবার চোখ যে একেবারে নেই, তা' নয়। মল্লিকার বড় মেজ দুই জা, যাঁরা একই বাড়ীতে 'ভিন্ন' হয়ে আছেন, তাঁরা এই 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' ছোট জায়ের গতিবিধির প্রতি

সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন, আর এ বিষয়ে দু'জনেই অভিন্ন আত্মা। কিন্তু মজা এই তাঁদের দুজোড়া চোখ অদৃশ্য পথে দৃষ্টি ফেলে বসে থাকে। মল্লিকার সেটা জানা নেই। তাই মল্লিকা প্রভাতের ছেলেমানুষীতে অথবা কাব্যি খেলানোয় বিব্রত পুলকে এদিক ওদিক তাকায় শুধু শ্বাশুড়ী বাড়ীতে আছেন কি না দেখতে।

নেই দেখে সহাস্যে বলে, 'কেরাণীগিরি' করে করেও এত কাব্য টিঁকে আছে প্রাণে ?'

'থাকবে না মানে ?' প্রভাত হাসে, 'কাব্য কি শুধুই বড় লোকের জন্যে ? কেরাণীরা অপাংক্তেয় ?'

'শুনেছি তো ও কাজ করতে করতে লোকের মাথায় ঘী টি সব ঘুঁটে হয়ে যায়।'

'যায় বুঝি ? কই আমার তো তা ম'নে—'

'এই, কী হচ্ছে ? ছাড়।'

'যদি না ছাড়ি।'

'রাহুর প্রেম ?'

'প্রায় তাই। কোথায় ছিলে, কোথা থেকে—শিকড় উপড়ে নিয়ে এসে পুঁতে দিলাম বাংলাদেশের ভিজে ভিজে নরম মাটিতে—'

'সে মাটির মর্য্যাদা কি রাখতে পেরেছি ?'

নম্র বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে প্রশ্ন করে মল্লিকা, চাপল্য ত্যাগ করে।

প্রভাতও চপলতা ছেড়ে গম্ভীর হয়। বলে, 'পেরেছ বৈ কি।'

মল্লিকা চুপ করে থাকে। আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে যায়।

এক সময় মল্লিকা বলে ওঠে, 'মা বলছিলেন, তোমার মামা কেমন ধারা লোক গো বৌমা! একখানা পোস্টকার্ড লিখেও তো কই উদ্দিশ করে না ?'

'তুমি কি উত্তর দিলে ?'

'কি আর দেব ? বললাম, মামা ওই রকমই। দায় চুকেছে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নইলে আর সম্প্রদান করার কষ্টটুকু পোহাতে রাজী হ'ন না, কুমারী মেয়েটাকে একজনের হাতে ছেড়ে দেন!' মা

বললেন 'তা' সত্যি। ধন্যি বটে।...তা' বাছা তুমিও তো কই চিঠিপত্র লেখ না?'...আবার কথা বানাতে হ'ল, বলতে হল, 'মামাকে চিঠি লিখি এত সাহস আমার নেই। ভীষণ ভয় করতাম তাঁকে। যা কিছু আদর আবদার ছিল, মামীর কাছে।'

'অনেক গল্প বানাতে শেখা গেল, কি বল? কলম ধরলে সাহিত্যিক নাম লাভ হতে পারতো।' হেসে বলে প্রভাত, 'একেবারে কথার জাল বোনা।' :

মল্লিকা বিমনা ভাবে বলে, 'তবু ফাঁক থেকে যায় কত জায়গায়। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।'

'ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মামা খোঁজ করছেন বলে মনে হয় তোমার?'

'পাগল হয়েছ?' প্রভাত হাসে, 'মেয়ে পালালে কেউ খোঁজ নেয়?'

'ঠিক ওই স্কেলে তো আমার জীবন আর সে জীবনের পরিস্থিতিকে মাপা চলে না? কে জানে তিনি বসে বসে প্রতিশোধের ছুরি শানাচ্ছেন কি না।'

ছুরি শানাচ্ছেন, এ ভয় প্রভাতেরই কি নেই? তবু সে পুরুষ মানুষ, মুখে হারতে রাজী নয়, তাই বলে ওঠে, 'ছুরি অত সস্তা নয়।'

বলে, কিন্তু বুকের মধ্যে ছুরি তার উঁচোনোই আছে। তবে এইটুকুই শুধু ভরসা, কলকাতার এই পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্য থেকে একটা লোককে খুঁজে বার করা সহজ নয়। বোধ করি সম্ভবই নয়।

তবু প্রায়ই এমন হয়।

আলোর ওপর হঠাৎ ছায়া এসে পড়ে। শুধু সে ছায়া স্থায়ী হতে পারে না, প্রভাতের স্বভাবের ঔজ্জ্বল্য, আর মল্লিকার একান্ত চেষ্টায়।...হঠাৎ এসে পড়া ছায়াকে প্রভাত উড়িয়ে দেয়, মল্লিকা চাপা দেয়।

কিন্তু মল্লিকাকে কি প্রভাত সম্পূর্ণ বুঝতে পারে?

এইখানেই কোথায় যেন সন্দেহের খটকা। মল্লিকার কল্যাণী বধূ

মূর্তির অন্তরালে, কি একটা উদ্দাম যৌবনা নারী যখন তখন শান্ত স্বভাব প্রভাতকে প্রখর যৌবনের জ্বালা দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চায় না—প্রভাত নামক নিরীহ পুরুষটাকে ?

'মল্লিকা' নামা দেহটা যেন একটা মসৃণ কোমল আবরণ। আর শঙ্কা হয়—যে কোনও মুহূর্তে সে আবরণ ভেদ করে ঝল্‌সে উঠবে ভিতরের প্রখরা।

কিন্তু এ ধারণাটা অন্যায়, এ চিন্তাটা হাস্যকর। প্রভাত ভাবে ওই তো কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ্‌, বাম হাতে গোটা তিন চার লোহা, দুহাতে শাঁখা চুরি বালা। নেহাৎ ঘরোয়া।

শাড়ী পরার ধরণটা পর্য্যন্ত ঘরোয়া করে ফেলেছে। একেবারে ঘরোয়া। মল্লিকা বদলে গেছে। মল্লিকা ঘরোয়া—হয়ে গেছে।

প্রভাত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

হ্যাঁ, স্বস্তি হয়েছে আজকাল সবদিকেই।

মল্লিকাকে নিয়ে পালিয়ে আসার পর থেকে সর্বদা যে ভয়ঙ্কর একটা অশরীরি আতঙ্ক প্রভাতের পিছু নিয়ে ফিরতো, সে আতঙ্কটা ক্রমশঃই যেন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃই ভাবতে অভ্যস্থ হচ্ছে, নাঃ, সে যেমন ভেবেছিলাম, তেমন নয়।

একেবারে ডিটেকটিভ্‌ গল্পের 'নর-পিশাচ' নয়। প্রথমটায় হয়তো খুব রেগেছিল, শাপ শাপান্ত করেছিল। হয়তো দুটোকে খুন করে ফেলবার স্পৃহাও জেগেছিল মনে, কিন্তু শেষে নিশ্চয়ই ভেবেছে এই নিয়ে টানাটানি করতে গেলে নিজেদেরই কোন ফাঁকে পুলিশের নজরে পড়ে যেতে হবে। আর সাধের ব্যবসা এবং প্রাণটি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। অতএব মনের রাগ মনে চেপে বসে আছে ভদ্রলোক।

শাপ শাপান্ত ? এ যুগে ওতে আর কিছুই হয় না। কলি যুগে ব্রহ্ম তেজ নির্বাসিত, ব্রহ্ম শাপ নিস্ফল। কাজেই স্বস্তি ! স্বস্তি। স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তি বোধকরি প্রভাতের কপালে নেই। তাই ক্রমেই যখন তার জীবনটায় ছায়ার চেয়ে আলোর ভাগটাই বেশী হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আবার ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তির কাঁটা এসে বিঁধল বুকের মধ্যে।

অফিসে টিফিন করতে বেরিয়েছিল, ফিরে আসতেই সহকর্মী সুরেশ দত্ত খবরটা দিল।

প্রভাত বিচলিত চিত্তে প্রশ্ন করল, 'আমার সন্ধান নিচ্ছিল ? নানান প্রশ্ন ? কেন বলুন তো ? কি রকম দেখতে লোকটা ?'

সুরেশ দত্ত আরামে পা নাচাতে নাচাতে বলে, 'অনেকটা ঘটক প্যাটার্নের দেখতে, বুঝলেন ? প্রজাপতি অফিস থেকে এরকম চরটর পাঠায় অফিসে। আইবুড়ো শুনলো, কি গাঁথবার তালে লেগে পড়ল।

প্রভাত বিরক্ত সুরে বলে, 'তা' আমি তো আর আইবুড়ো নই ? আমার সন্ধান সুলুক নেবার দরকারটা কি ?'

'ওইতো—' সুরেশ দত্ত একটি রহস্যময় মধুর হাসি হেসে বলে, 'দিলাম একখানি রাম ভাঁওতা। এখন খুঁজুক বসে বসে আপনার ঠিকুজি কুলুজি গাঁই গোত্তর ! তারপর—'

'থামুন আপনি। ছেলেমানুষী করবেন না—'

সুরেশ দত্তর আরও গড়িয়ে পড়া মোলায়েম মসৃণ হাসিখানিকে নিভিয়ে দিয়ে প্রভাত প্রায় ধমকে ওঠে, 'ঠাট্টা তামাসারও একটা মাত্রা রাখা উচিত।'

সুরেশ বোধকরি অপমান ঢাকতেই অপমানটা হজম করে নিয়ে, বিলম্বিত দীর্ঘ লয়ে বলে, 'মাত্রা আছে বলেই তো আপনাকে এগিয়ে ধরলাম। না থাকলে—নিজেকেই একখানি সুপাত্র বলে চালান করতাম। করলাম না। ভেবে দেখলাম—বাড়ীর ঠিকানা জোগাড় করে যদি সেখানে ধাওয়া করে কে জানে লোকটা পৈত্রিক প্রাণটুকু খুইয়ে আসবে কিনা। মানে আমার গিন্নীটির কবলে পড়লে—।

'বাজে কথা রাখুন, লোকটার চেহারা কি রকম তাই বলুন ?'

সুরেশ দত্ত সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো প্রভাতবাবু ? আপনার ধরণধারণ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন ফেরারি আসামী আর টিকটিকি পুলিশ আপনার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। লোকটা তো অফিসের অনেকেরই নামধাম খোঁজ করছিল, কে কে ব্যাচিলার আছে সেইদিকেই যেন ঝোঁক তার। তা কই আর তো

কেউ আপনার মত ক্ষেপে উঠল না? বললাম তো শচীনকে, অমরকে, শ্যামল বাবুকে।'

এবার প্রভাত একটু লজ্জিত হয়।

তাড়াতাড়ি বলে, 'ক্ষ্যাপার কথা হচ্ছে না। আপনি খামোকা লোকটাকে আমার একটা ভুল পরিচয় দিতে গেলেন কেন, তাই ভাবছি। হয়তো ওই ব্যাচিলার শুনে বাড়ী গিয়ে ঝামেলা করবে।'

'করুক না। একটু মজা হবে।'

সুরেশ আবার আরামের এলায়িত ভঙ্গী করে বলে, 'জীবনটাকে একেবারে মিলিটারীর দৃষ্টিতে দেখবেন কেন? একটু রঙ্গরস, একটু মজা, একটু ভুল বোঝাবুঝি, এসব নইলে আর রইল কি মশাই।'

'নাঃ আপনি একেবারে—' বলে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে চলে যায় প্রভাত। কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারে না। মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে থাকে। কে সে? কে আসতে পারে প্রভাতের খোঁজে?

'আরাম কুঞ্জের প্রোপ্রাইটার এন কে চ্যাটার্জি ছাড়া প্রভাতের জানা শোনাদের মধ্যে কে এমন আধাবয়সী ভদ্রলোক আছে, যে লোক গলাবন্ধ কোট পরে?

আচ্ছা, প্রভাত এতই বা ভাবছে কেন?

সত্যিই তো ওই প্রজাপতি অফিসের লোক হতে পারে? নিছক্ বাজে একটা লোককে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে প্রভাত।

ভাবে। মনকে প্রবোধ দেয়।

কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। সে যেন একটা অশরীরি ছায়া দেখতে পাচ্ছে, যে ছায়া তার অন্ধকারের মুঠি বাড়িয়ে প্রভাতের গলা টিপে ধরতে আসছে।

অফিস ফেরার পথে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চলে প্রভাত।

ইতিমধ্যেই কি বাড়ীতে কোনও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে? প্রভাতকে ফিরে গিয়েই সেই দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে?

কী সেই দৃশ্য? মল্লিকা নেই? মল্লিকা খুন হয়েছে?

ভগবান! এ কী আবোল তাবোল ভাবছে প্রভাত। বাড়ীতে তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রভাতকে কেউ খবর দিত না? পাড়ায় তো জ্ঞাতি গোত্রের অভাব নেই। এমনিতে তারা সর্বদা বুকের মধ্যে 'দীর্ঘাঙ্গ' পুষে রাখলেও বিপদে আপদে দেখে বৈ কি।

না না, বিপদ কিছু হয় নি।

আচ্ছা বাড়ী গিয়ে কি তবে মল্লিকাকে এই খবরটা জানিয়ে সাবধান করে রাখবে প্রভাত? বলবে, 'কে জানে হয়তো তোমার মামা এতদিনে সন্ধান পেয়ে—'

না, না, কাজ নেই। প্রভাত ভবল অকারণ ভয় পাইয়ে দিয়ে লাভ কি? হয়তো সত্যিই কিছু না। অজস্র ভাবনা এসে ভীড় করে। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে আসে।

মানুষ নির্ভীক হয় কেমন করে? সামান্যতম ভয়ের ছায়াতেই যদি তার দেহমন অবশ হয়ে আসে?

ভেবে পায় না প্রভাত, কি করে মানুষ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডের নায়ক হয়ে হাস্যমুখে ঘুরে বেড়াতে পারে সমাজের সর্বস্তরে।

আবার ভাবল, আশ্চর্য্য। আমিই বা কি করে পেরেছিলাম মল্লিকাকে চুরি করে আনতে।

প্রভাত যখন ভাবনার সমুদ্র এমনি টলমল করতে করতে বাড়ী ফিরছিল, তখন প্রোপ্রাইটার এন কে চ্যাটার্জি প্রভাতেরই এক জ্ঞাতি কাকার বাড়ীতে জাঁকিয়ে বসে প্রশ্ন করছিল 'বলেন কি? আপনারা তাকে জাতিচ্যুত করলেন না?'

'জাতিচ্যুত।'

জ্ঞাতিকাকা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'জাতি কোথায়? যে তার থেকে 'চ্যুত' করবো? আপনি ঘটকালি করে খান, আপনি খবর রাখেন না একালে 'জাতি ধর্ম' কথাগুলো কোন পাঁশগাদায় আশ্রয় পেয়েছে!'

'জানি আজ্ঞে। জানি সবই। তবে কিনা আপনারা হলেন গিয়ে গোস্বামী বংশোদ্ভূত, আপনাদের কথা আবশ্যিই স্বতন্ত্র।'

'কিছু স্বতন্ত্র নয় দাদা! ও আপনার গিয়ে সবাইকেই এক জাঁতার তলায় ফেলে পেষাই করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ছিল বটে মান মর্যেদা এক সময়। সে সব এখন হাস্যকর। কুলশীল বংশমর্য্যাদা ওসব কথাগুলোই এখন 'ভুতো' হয়ে গেছে। ওকথা বলতে গেলে লোকে এখন হাসে, নাক বাঁকায়! নইলে—এইতো, কোথা থেকে না কোথা থেকে একটা পরমা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এল, বলল কোন চুলোয় কাকা না মামা কে আছে, ব্যস্, হয়ে গেল সে মেয়ে ঘরের বৌ। সে বৌ ভাতের হাঁড়িতেও কাঠি দিচ্ছে, নারায়ণের ঘরেও সন্ধ্যেদীপ দিচ্ছে। পাড়া পড়শীর বাড়ি গিয়ে এক পংক্তিতে খাচ্ছেও। আমরাই আর ওসব মান করি না। যে কালে যে ধর্ম।...তবে হ্যাঁ মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। যেমন দেবী প্রতিমার মত রূপ, শুনেছি তেমনি নাকি শিক্ষা সহবৎ।...যাক্ মশাই তাই হলেই হল। এ যুগের কাছে আমরা এই আগের যুগেররা কতটুকু কী চাই বলুন তো? ওই একটু শিক্ষা সহবৎ। গুরুজনকে ক্ষ্যামাঘেন্না করে একটু 'গুরুজন' বলে মানলো তো বর্তে গেলাম আমরা। তা' আমার বড়ভাজের কাছে, মানে ওই প্রভাতবাবুর মায়ের কাছে শুনতে পাই মেয়েব নাকি গুণের সীমা নেই।...এই। এইটুকুই তো দরকার। যাক আপনাকে আর বেশী কি বলবো? দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারও কর্মভোগ, তাই এসেছেন বিয়ে হওয়া ছেলের জন্যে সম্বন্ধ করতে। হাতের কাছে আর কোনও পাত্রতো দেখছিও না যে আপনাকে—'

'থাক থাক!'

চ্যাটার্জি উঠে পড়ে বলে 'এইটির কথাই শুনে এসেছিলাম। তবে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেছে। যাক্, আপনার মত একজন সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল, এটাই পরম লাভ।' বিনয়ে বিগলিত হয় সে।

জ্ঞাতি কাকা বলেন, 'সজ্জন? হাসালেন মশাই। দুর্জন অতি দুর্জন। তবে না কি দুনিয়ার হালচাল দেখে দার্শনিক হয়ে গেছি। নইলে ওই কাণ্ডর পর আমার ওই জ্ঞাতি ভাজের বাড়ীতে কাউকে জলস্পর্শ করতে দিতাম? দিতাম না। আগে হলে দিতাম না। এখন ওই যা বললাম—দার্শনিক হয়ে গেছি। তবে হ্যাঁ, মেয়েটা

খারাপ ঘরের নয়, দেখলেই বোঝা যায়। এই যে আমি কে না কে, কিন্তু নিত্য সকালে আমার ওবাড়ীতে চায়ের বরাদ্দ হয়ে গেছে। কেন? ওই বৌটির আকিঞ্চনে। কই আরও ঢের বৌ তো আছে পল্লীতে, কে পুঁছছে? আমার ওই ভাজটির হাত দিয়ে তো জল গলতো না, এখন বৌটির কারণেই—'হুঁ' হয়ে যাচ্ছেন না? চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা যেতেই পারেন। এ যুগে তো আর বৌ-ঝির মধ্যে এমন নম্রতা দেখা যায় না।...আচ্ছা তবে—।'

চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন জ্ঞাতিকাকা। তা হয়তো বোঝবার মতই বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল প্রোপ্রাইটার এন্ কে চ্যাটার্জির চোখ জোড়া।

'এন্ কে!' এই নামেই পরিচিত চ্যাটার্জি। ব্যবসা ক্ষেত্রে ওটাই অনেক সময় 'কোডে'র কাজ করে। কিন্তু একদা ওর একটা নাম ছিল না? যে নাম সে নিজেই ভুলে গেছে। নন্দকুমার না? নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়। হরিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অকালকুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গার ছেলে।

কিন্তু তার মনটা আবার এমন নরম প্যাচ্‌পেচে হয়ে যাচ্ছে কী করে? খামোকা চোখেই বা তাঁর খানিকটা জল উপছে পড়ছে কেন তার বেইমান ভাগ্নীটার সুখের সংসারের গল্প শুনে? আশ্চয্যি, আশ্চয্যি। এন, কে, র ভাগ্নী, যে ছিল এন, কের শিকার ধরবার রঙিন রেশমি ফাঁদ, সে কিনা তার মার মত বোনের মত ঠাকুমা পিসিমাদের মত 'লক্ষ্মী বউ' নাম কিনে সুখেশান্তিতে স্বামীর ঘর করছে।

সে আর নরককুণ্ডে বসে লুব্ধ শয়তানদের হাতে মদের গ্লাস এগিয়ে দেয় না, স্বর্গের এক কোণায় ঠাঁই করে নিয়েছে সে নিজেকে, সেখানে বসে সে ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজায়, গুরুজন পরিজনদের হাতে তৃষ্ণার জল এগিয়ে দেয়!

চাটুয্যে কি তার চিরদিনের 'পাষণ্ড' নামের ঐতিহ্য বহন করেই চলবে? স্বর্গের এক কোণে যে এতটুকু একটু জায়গা গড়ে নিয়ে শুভ্র হয়ে উঠেছে পবিত্র হয়ে উঠেছে, তাকে তার সেই জায়গা থেকে টেনে নামাবে? চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে আবার সেই

পুরনো নরককুণ্ডে। তাকে ডাণ্ডা মেরে মেরে বাধ্য করবে ক্ষুধার্ত বাঘেদের গুহায় ঢুকতে। বাধ্য করবে সেই বাঘেদের মদের গ্লাস এগিয়ে দিতে, তাদের সামনে ঘুঙুর পরে নাচতে, কটাক্ষ হেনে মন কাড়তে।

নইলে—চাটুয্যের ব্যবসা পড়ে যাবে? আয় উন্নতি কমে যাবে?

মাতালগুলোকে আরও মাতাল করে ফেলে সে সুবিধেগুলো আদায় করতে পারতো সেগুলো আর আদায় হবে না?

অতএব চাটুয্যে—

কিন্তু জীবনে একবার যদি চাটুয্যে তার সেই পাষণ্ড নামের ঐতিহ্য ভোলে? যদি সত্যিকার মামা কাকার মত মেয়েটাকে আশীর্বাদ করে তাকে তার কল্যাণের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রেখে হাসিমুখে ফিরে যায়?

লোকসান হবে 'এন্ কে'র। কিন্তু কতখানি?

কত খাবে সে একটা পেটে? কত পরবে একটা দেহে? কতদিন আরও বাঁচবে—বাহান্ন বছর পার হয়ে যাবার পর?

চিন্তা জর্জর প্রভাত বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই করুণাময়ী কাছে এসে ব্যঙ্গ মিশ্রিত খুশি খুশি হাসি হেসে বলেন, 'ওরে প্রভাত তোর বৌয়ের যে কপাল ফিরেছে, নিরুদ্দিশ রাজার উদ্দিশ হয়েছে! মামা এসেছে দেখতে!'

'কে এসেছে? কে!'

বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রভাত। অনেকরকম ভাবছিল সে, কিন্তু এই প্রকাশ্য অভিযানের চেহারা একবারও কল্পনা করে নি।

'তা' 'হাঁ' হয়ে যাবারই কথা। ছোট বৌমাও শুনে প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, 'হাঁ' করে তাকিয়ে বসেছিল। মামাকে নাকি আবার ভয়ও করে খুব। মানুষটা কিন্তু ভয়ের মত নয়। বরং একটু হাবলা-ক্যাবলা মতন। আর বিনয়ের তো অবতার। 'বেয়ান' 'বেয়ান' করে একেবারে জোড়হস্ত।'

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলে, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো খানিক আগে। ফল মিষ্টি সরবৎ খাইয়েছি। দৈ দস্তুর করলাম, তা' বলছে থাকতে পারবে না, রাত্তিরের গাড়ীতেই চলে যেতে হবে। কী যেন দরকারি কাজে একদিনের জন্যে এসেছে, নেহাৎ নাকি জামাই বাড়ীটা হাওড়া ইষ্টিশনের গায়ে, তাই—' করুণাময়ী মুখে চোখে একটি আত্মপ্রসাদের ভঙ্গী এঁকে কথার উপসংহার করেন, 'তবু আমি একেবারে ছেড়ে কথা কই নি, শুনিয়ে দিয়েছি বুড়োকে বেশ দু' চার কথা—'

প্রভাত রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'শুনিয়ে দিয়েছ ? কী শুনিয়ে দিয়েছ ?'

'কী আবার শোনাবো, ন্যায্য কথাই শুনিয়েছি। কেন তোর পরম পূজ্য মামা শ্বশুরের বুঝি আর দোষ ত্রুটি কিছু নেই ? বলি সাত জন্মে একটা উদ্দিশ করে ? আজ এখন একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে—'

'রসগোল্লা ? এক হাঁড়ি—রসগোল্লা !' প্রভাত হঠাৎ চাপা গর্জনে বলে ওঠে, 'তোমার ছোট বৌ খেয়েছে সে রসগোল্লা ?'

'ওমা শোন কথা ! অ সতে আসতেই অমনি হাঁড়ি খুলে খাওয়াতে বসবো ? কেন আমার বৌ কি পেট ধুয়ে বসেছিল ? বলি—মামা-শ্বশুরের নাম শুনে, তুই অমন ভূতে পাওয়ার মতন করছিস কেন ? তোরও কি ভয়ের ছোঁয়াছ লাগল না কি ? তা' ছোট বৌমা তো তবু যাইহোক ধাতস্থ হয়ে—'

'কোথায় সে ? তার সঙ্গে এক ঘরে ?'

মার বিস্ময় অগ্রাহ্য করে প্রভাত মরীয়ার মত ছোটে। কী এনেছে মল্লিকার মামা মল্লিকার জন্যে ?

বিষ মাখানো রসগোল্লা, না বিষাক্ত ছুরি।

করুণাময়ী গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন। ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত করেন, 'আর কিছু নয়, বুড়োটার অমতেই বোধহয় এ কাজ হয়েছে। তাই ছুটোতেই ভয় পাচ্ছে। তখনই বুঝেছিলাম গণ্ডগোল একটা আছেই। তবু যতই হোক স্নেহ নিম্নগামী।' তাই বুড়ো একঘণ্টার জন্যেও মরতে মরতে দেখতে এসেছে মিষ্টির হাঁড়ি বুকে করে। যাই হাঁড়িটা সরিয়ে ফেলি। বেশী করে চারটি 'ভাল দিকে' রাখতে হবে।

পাঠক ঠাকুরের জন্যে নিয়ে যাব। কিনে কেটে বেশী দেওয়া তো হয় না বড়।...যে আমার বড়বৌটি আর মেজবৌটি, এক্ষণি উঁকি দেবে, আর ছোটজায়ের কান ভাঙাবে, 'তোর মমা অত মিষ্টি আনল, তুই কটা পেলি?'

রসগোল্লা সামলাতে সরে যান করুণাময়ী।

কিন্তু করুণাময়ীর ছেলে কেমন কবে সামলাবে নিজেকে? কী করে বুঝবে এ স্বপ্ন না মায়া? শয়তানী না স্বর্গীয় সুষমা।

আরামকুঞ্জব প্রোপ্রাইটাব এন, কে চ্যাটার্জি কি হঠাৎ ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়ে সমস্ত ক্লেদ মুক্ত হয়ে, মহৎ হয়ে গেছে? সুন্দব হয়ে উঠেছে?

হয়তো তাই।

হয়তো ক্লেদাক্ত মানুষটা নির্মল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের স্পর্শ কখনো কখনো এসে পৌঁছয় বুঝি কুৎসিত জীবনের কাদার উপর।

তাই বারম্বার কোটের হাতায় চোখ মুছছে রিষড়ের হরিকুমারের ছেলে নন্দকুমার।

'সুখে থাক মা, শান্তিতে থাক্। আমি তোর হতভাগা পাষণ্ড মামা, কত জুলুম করেছি তোর ওপর কত কষ্ট দিয়েছি। তবু এই কু মনে জানিস যা করেছি বুদ্ধির ভুলে করেছি। কিন্তু তুই আমার মেয়ে নয় ভাগ্নী, একথা কোনদিন মনে করি নি।'

মল্লিকা বুঝতে পারে না।

মল্লিকা দিশেহারা হয়ে এই ভাবাবেগের অর্থ খোঁজে। এ কী তার চির অভিনেতা মামার এক নতুন অভিনয়? নিখুঁত, নিপুণ! নাকি হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আর অসম্ভবকে সম্ভব করা সন্ধান করে করে শুধু তার পালানো ভাগ্নীকে আশীর্বাদ করতে এসেছে আরামকুঞ্জর প্রোপ্রাইটার এন কে চ্যাটার্জি?

সেই আশীর্বাদটুকু দিয়েই আবার ফিরে চলে যাবে সেই হাজার

মাইল ভেঙে? কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধি নয়? কোনও হিংস্র প্রতিশোধ নয়? অতীত কলঙ্কের কথা ফাঁস করে দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা নয়, কিছুই নয়?

'এই যে বাবাজী।'

তাড়াতাড়ি চোখের শেষ অশ্রুটুকু কোটের হাতায় নিশ্চিহ্ন করে চাটুয্যে বলে, 'কী বলে যে তোমায় আশীর্বাদ করবো! ভাল ভাল কথা তেমন জানি না, তাই শুধু বলছি তুমি সুখী হও, দেবতা তুমি, অধিক আর কি বলবো।'

প্রভাত থতমত খায়। হতভম্ব হয়। এ কী!

জগতের যত বিস্ময় সবই কি আজ প্রভাতের জন্যই অপেক্ষা করছিল? শাণিত ছোরার বদলে আশীর্বাদের শান্তিবারি!

কিংকর্তব্য বিমূঢ় প্রভাত আর কিছু ভেবে না পেয়ে হঠাৎ হেঁট হয়ে চাটুয্যের পায়ের ধুলো নেয়। ঠিক যেমন নেয় ভদ্র জামাইরা বাড়ীতে শ্বশুর সম্পর্কীয় কেউ বেড়াতে এলে।

চাটুয্যেও ঠিক ভদ্র শ্বশুরের মতই বলে, 'থাক থাক। দীর্ঘজীবী হও! মল্লিকা মাকে তাই বলছিলাম, অনেক জন্মের পুণ্যে দেবতার দেখা পেয়েছিলি তাই তরে গেল, নরক থেকে ত্রাণ পেলি। স্বর্গ থেকে তোর মা আজ তোদের শত আশীর্বাদ করছে। তোমাকে আর কি বলবো বাবা, পাণ্ডব-বর্জিত দেশে পড়েছিলাম, সৎপাত্রে মেয়েটার বিয়ে হয়তো জীবনেও দিতে পারতাম না! দেখে গেলাম, —বড় শান্তি পেয়ে গেলাম! তবে যাই মা মল্লিকা। আসি বাবা প্রভাত।...বেয়ান কোথায় গেলেন, বেয়ান। বড় মহৎ মানুষ। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।'

স্বভাব বাচাল লোকটা বেশী কথা না কয়ে পারে না। কিন্তু যারা শোনে, তারা অকূল সমুদ্রে আথালি পাথালি করতে থাকে।

সৎ বস্তু, সুন্দর বস্তু, মহৎ বস্তুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারার মত যন্ত্রণা আর কি আছে?

অনেক রাত্রে বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ. আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে, জানলার ধারে চৌকীটাকে টেনে এনে বসে আছে ওরা।…প্রভাতের মুখে প্রসন্নতা। কিন্তু মল্লিকার মুখ ভাবশূন্য।

মল্লিকা যেন এখানে বসে নেই।

প্রভাত এই ছায়াছায়া জ্যোৎস্নায় হয়তো ধরতে পারে না সেই অনুপস্থিতি, তাই ওর একটা হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে গভীর সুরে বলে, 'মানুষের কত পরিবর্ত্তনই হয়!'

মল্লিকা কথা বলে না।

প্রভাতই আবার বলে, 'স্বার্থবুদ্ধিতে যাই করে থাকুন, তোমার মামা কিন্তু তোমাকে ভালবাসেন খুব!'

মল্লিকা তবু নীরব।

প্রভাত একটু অপেক্ষা করে বলে, 'ছেলেমেয়ে তো নেই, নিজের! সাপের বাঘেরও বাৎসল্য স্নেহ থাকে কি বল? তাই না?'

মল্লিকা একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঘুম পাচ্ছে, শুচ্ছি।'

চাঁদের আলো রেলগাড়ীর মধ্যেও এসে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল না নন্দকুমার চাটুয্যের। আর অদ্ভুত একটা ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। সে ইচ্ছে কামরার দরজাটা খুলে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়বার। পড়লে কেমন হয়?

গাড়ীটা যে ক্রমশঃই তাকে তার ভয়ঙ্কর একটা আশার ঘর থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে! এই করতেই কি হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল চাটুয্যে, হাজার লোকের কাছে সন্ধান নিয়ে? পেয়ে হারাবার জন্যে?

আশ্চর্য! বুদ্ধির গোড়ায় কি শনি ধরেছিল চাটুয্যের? তাই তার তখন অকারণ মনে হচ্ছিল যার জন্যে ছুটোছুটি তার বদলে খুব মস্ত একটা কি পেলাম! সেই 'পরম পাওয়ার' মিথ্যা আশ্বাসে মুঠোয় পাওয়া জিনিস মুঠো খুলে ফেলে দিয়ে এল।

'এন্ কে'র মত ঘোড়েল লোকটা কিনা ঘায়েল হয়ে গেল সস্তা একটু ভাবালুতায়? আসলে সর্বনাশ করেছিল মেয়েটার ওই টানটান

করে চুল বাঁধা কপালের মাঝখানের মস্ত সিঁদুর টিপটা। ওই কপালটা দেখে মনে হচ্ছিল না ও মল্লিকা। মনে হ'ল ও হরিকুমার চাটুয্যের সেই কিশোরী মেয়েটা! অকাল কুষ্মাণ্ড নন্দকুমারের ছোট বোন। যে বোনটা পরে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সয়ে আর চেহারা সাজ বদলে, তবে মরেছিল।

কিন্তু যখন মরেনি, সাজ বদলায় নি, তখন অমনি টানটান করে চুল বাঁধতো সেই মেয়েটা, আর ফর্সা ধবধপে কপালের মাঝখানে ওই রকম জ্বলজ্বলে একটা টীপ পরতো।

মল্লিকা যেন নন্দকুমারের দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্যেই তার মরা ছোট বোনের চেহারা আর সাজ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল!

কিন্তু 'এন কে' পাগল নয়। সাময়িক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে সে। উঃ, ভাগ্যিস ঠিকানাটা ভাল করে লিখে আনা হয়েছে

গণেশ মুচকি হেসে বলে, 'জানতাম!'

'জানতিস? কী জানতিস রে শূয়ার'?

'জানতাম ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।'

'পারব না। অমনি জানতিস তুই?'

চির পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে নিজেকে একটা গাধা বলে মনে হয় চাটুয্যের। তবু মুখে হারে না। বলে, 'তোর মতন তো বুদ্ধু নই যে একটা হঠকারিতা করে বসবো? দেখে এলাম, এবার চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। ট্যাণ্ডন ফিরেছে?'

'কবে!' এসে বলল, 'এন কের' মেয়েকে খুঁজে বেড়াবার এত কী দায় আমার? মেয়ের কি অভাব আছে? ভাড়া ফেললেই মেলে। কত চাও?'

'হুঁ। টাকার কাঁড়ি খেয়ে—অ.ব.র লম্বা লম্বা বোলচাল। দেখাচ্ছি বাছাধনকে। আর নায়ার?'

'তার কোন খবর জানি না।'

তা' খবর জানবার কথাও নয়।

সে তখন চাটুয্যের ফেলে আসা পথেই ঘোরাফেরা করছে।

সে কথা বলাবলি করে করুণাময়ীর বড়বৌ আর মেজবৌ। পর-নিন্দারূপ মহৎ আর শোভন কাজটিতে তাদের 'ভাবে'র আর অন্ত নেই।

সেই 'ভাবে'র ক্ষেত্রে বসে দু'জনে বলাবলি করে, 'মামা এসে যাবার পর থেকে ছোটবৌয়ের কী রকম অহঙ্কার অহঙ্কার ভাব হয়েছে দেখেছিস?'

'তা' আর দেখিনি? শাশুড়ীকে লুকিয়ে কত আসতো, বসতো, কাজ শিখতো আগ্রহ করে, আর এখন এমুখো হয় না।'

'দেখছি তাই। এখন আবার দেখছি ওবাড়ীর নতুন ঠাকুরপোর সঙ্গে ভাবের ঢলাঢলি, না কি জুয়া খেলাখেলি চলে।'

'জুয়া!'

'তাই তো বললো ঠাকুরপো। ডাকলাম সেদিন যাবার পথে। বললাম, 'কী গো, নতুনকে পেয়ে পুরনোদের যে একেবারে ভুলেই গেলে? তা অপ্রতিভ হয়ে বললো, প্রভাতদার বৌ অনেক রকম তাস খেলা জানে, তাই শিখেছি—'

'লজ্জাও করে না। মেয়েমানুষের কাছে খেলা শেখা—'

'মরণ তোমার! মেয়েমানুষই তো সকল খেলার কাজী। তেমন তেমন খেলিয়ে মেয়েমানুষ হলে—তা আমাদের ইটিও ত কম যান না। এসে অবধি তো অনেক খেলাই দেখাচ্ছেন। এই একেবারে কোনে বৌটি, চোখ তুলে তাকান না! এই আবার দেখ, যেন সিনেমা এ্যাকট্রেস। চোখের চাউনি ভুরুর নাচুনি দেখলে তাক লেগে যায়। ঠাট দেখলে গা জ্বলে। ঠাকুরপো চুপি চুপি বলল, ওসব তাস খেলা না কি স্রেফ জুয়া খেলা। বাজী ধরে খেলা তো? বলে না কি, কত খারাপ খারাপ বড়লোক ওই তাস খেলাতেই সর্বস্বান্ত হয়।'

'বলি এত সব জানলো কোথায় ও?'

'কী জানি বাবা! আমরা তো সাতজন্মেও শুনি নি ওসব, জানা তো দূরের কথা। শুধু কি তাই, ঠাকুরপোর কাছে নাকি একদিন বাহাদুরী করে বলেছে—যত রকম মদ আছে জগতে, আর যতরকম সিগারেট

পাওয়া যায় বাজারে, ও নাকি সমস্তর নাম জানে।'

'এত সব তোমায় বলল কে গো?'

'কে আর, ছোঁড়াটাই। বলেছে কি আর বুঝে? আমিই কুরে কুরে বার করেছি। 'এতক্ষণ কিসের কথা হচ্ছিল গো?' জিগ্যেস্ করলেই ভয় পেয়ে বলে ফেলে। কিছু কথা হচ্ছিল না, শুধু মুখপানে চেয়ে বসেছিলাম এই কথা পাছে দাঁড়ায়, সেই ভয় আর কি।'

'তা' ভয় ভাঙতে আর কতক্ষণ? মেয়েমানুষ যদি প্রশ্রয় দেয়? হাঁদা ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে হল আর কি!'

'আমাদের ছোটবাবুরও হয়েছে ভাল। ওই বৌয়ের মনোরঞ্জন করে তো চলতে হচ্ছে?'

এমনি অনেক কথা হয় দুই জায়ে।

এমনিতে যারা পান থেকে চুণ খসলে পাড়া জানিয়ে কোঁদল করে।

ওদের আলোচনার মধ্যে থেকে যে ইসারা উঁকি মারে, সেটা কিন্তু খুব একটা মিথ্যে নয়। খুড়তুতো দ্যাওর পরিমলকে নিয়ে হঠাৎ যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে মল্লিকা। বিশেষ করে তাস নিয়ে যেন মেতে ওঠে, কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি আর সহসা উচ্চকিত হাসির শব্দ বাড়ী ছাড়িয়ে অন্য বাড়ী পৌঁছয়।

করুণাময়ী বাড়ীতে খুব কমই থাকেন এই রক্ষে, তবু মাঝে মাঝে বিরক্ত হন তিনি। বলেন, 'মামা এসে একদিন দেখা দিয়ে গিয়ে আসপদ্দাটা যেন বড় বাড়িয়ে দিয়ে গেল মনে হচ্ছে। কই, এত বাচাল তো ছিল না ছোটবৌমা! অতবড় ডাগর ছেলেটার সঙ্গে এত কিসের কষ্টি-নষ্টি? ওর লেখাপড়া আছে, ওর মাথায় তাসের নেশা ঢুকিয়ে দেবার দরকারই বা কি?'

প্রভাতকে লক্ষ্য করেই অবশ্য বলতেন এসব কথা।

প্রথম প্রথম প্রভাত হেসে ওড়াত। বলতো, 'ডাগর ছেলেটা তোমার বৌয়ের থেকে পাঁচ বছরের ছোট মা?'···বলতো—'মামা হঠাৎ একদিন দেখা দিয়ে মন কেমন বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন, মনটা প্রফুল্ল করতে যদি একটু খেলাধুলো করে ক্ষতি কি? বৌদিরা তো ও রসে

বঞ্চিত, তাই পরিটাকেই ধরে এ.ন—'

বলাবাহুল্য 'বৌ.দিদের' সঙ্গে বেশী মাখামাখি যে করুণাময়ীর চক্ষুশূল সে কথা জানতে বাকী নেই প্রভাতের, ওইটাই বলতো মাকে থামাতে। 'কুটিল কুচকুরে' (করুণাময়ীর ভাষায়) বৌ দুটোর চেয়ে যে খোলামেলা-মন দ্যাওর.পোটা.কে তিনি শ্রেয় মনে করবেন এ সত্য প্রভাতের জানা।

কিন্তু প্রভাতের নিজেরই এক.দিন বিরক্তি এল।

ছাতে উঠে গিয়ে তাসের আসর বসানোর সখটা তার চোখে একটু বেশী বাড়াবা.ড়ি ঠেকল।

উঠে গেল নিজেই। দেখল পাতা মাদুরের ওপর তাসগুলো এ.লোমেলো ছড়ানো, আর কি একটা জিনিস নিয়ে তুমুল কাড়াকাড়ি করছে পরিমল আব ম ল্লকা।

'ব্যাপার কি ?' ভুরু কুঁচকালো প্রভাত।

প.রিমল অপ্র তিভ হয়ে হাত ছে.ড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে বলে, 'দেখনা, চার টা.কা হেরে গিয়ে বৌ.দি এখন আমার জিতের পয়সা দেবে না বলছে।'

'টাকা, পয়সা, এসব কি কথা ? বাজী ধরে তাস খেলা হচ্ছে না কি ?' ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে প্রভাত। আর স.ঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের সেই গাম্ভী.র্য.কে নস্যা.ৎ করে হেসে ওঠে ম.ল্লিকা। ব.চাল হা.সি।

'বাজী না ধরলে কি আর খেলায় চা.র্ম আসে ?'

'না না এসব অ.মার ভাল লাগে না। টাকা পয়সা নিয়ে খেলা—'

'ভয় নেই—তোমার পয়সা খোওয়া যায় না। খেলা শেষে আবার ফেরৎ নেওয়া নিই হয়।'

প্রভাত স্পষ্ট বির.ক্তি প্রকাশ করে বলে, 'তাই যদি হয় তো, এ খেলার দরকারটাই বা কি ?'

আর সে বিরক্তিকে ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে ম.ল্লিকা, 'দরকার যে কি তুমি তার কি বুঝবে ? তু মি ও রসে ব.ঞ্চিত ! তোমাদের এই স্রেফ আলু-ভাতের আস্বাদবাহী সংসারে দম বন্ধ হয়ে আসে যে মানুষের !'

প্রভাত একটু নরম হয়।

ভাবে, সত্যি ও ছেলেমানুষ, একটু আমোদ আহ্লাদের দরকার আছে বৈ কি। বাড়ীটা আমাদের সত্যিই বড় স্তিমিত। আমি সারাদিন খেটে খুটে এসে বাড়ীর আরামটি, ঘরের খোপ্‌টি চাই, মা নিজে পাড়া বেড়িয়ে বেড়ান, অথচ ওকে একটু আধটু বেরোতে দিতেও নারাজ, বেচারার দম বন্ধ হয়ে আসা অন্যায় নয়।

আর তা ছাড়া—

চকিত লজ্জায় একবার ভাবে, একটা বাচ্চাটাচ্চাও হলে হতে পারতো এতদিনে। আর তা'হলে নিঃসঙ্গতা বোধ করে পাড়ার দ্যাওরকে খোসামোদ করে তাস খেলতে হতোনা ওকে।

কিন্তু প্রভাত বিচক্ষণ। এক্ষুণি সংসার বাড়িয়ে ফেলতে নারাজ।

সে যাক।

আপাততঃ ভিতরে নরম হলেও পরিমলকে শিক্ষা শাসন দেবার জন্যেই গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বলে, 'তা হোক। তাস খেলা ছাড়াও জগতে অনেক কাজ আছে। বই পড়লেই পার। তাছাড়া দু'জনে আবার খেলা কি? জমে না কি?'

হঠাৎ প্রভাতকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক টুকরো ইঙ্গিতবাহী রহস্যময় হাসি হেসে মল্লিকা বলে ওঠে, 'খেলা তো দু'জনেই জমে ভাল।'

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরিমল পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, আর মল্লিকা সহসা সেই তাস ছড়ানো পাতা মাদুরটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

মল্লিকার হাসিটাও যেমন অস্বস্তির, কান্নাটাও তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। আর প্রভাতের কছে দুটোই অর্থহীন। তবু কান্না, কান্নাই।

অর্থহীন হলেও কান্না দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ভয়ঙ্কর কোনও আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেও না। আর অপর পক্ষের কান্নার ভার এ পক্ষের অপরাধের পাল্লাটা ভারী করে তোলেই।

প্রভাতের মনে পড়ে, এর আগে আর কোনদিন মল্লিকাকে এমন তিরস্কার করে নি সে। খুবই স্বাভাবিক যে মল্লিকা আহত হবে। তবে?

তবে কতক্ষণ আর পড়ে পড়ে কাঁদতে দেওয়া যায় মল্লিকাকে ?

প্রভাত মনে মনে সংকল্প মন্ত্রপাঠ করে, নাঃ, কাল থেকে আর এ রকম নয়। মল্লিকার দিকে একটু অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। মল্লিকার জন্যে একটু অধিক সময়।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই—

পাড়ার যে পুরনো ক্লাবটা একদা প্রভাতের কৈশোর আর নব-যৌবন কালের একান্ত আনন্দের আশ্রয় ছিল, যার মাধ্যমেই তারা গড়ে তুলেছিল ওই 'হাওড়া যুব পাঠাগার', আর এখন যে ক্লাবের টিম বড় বড় জায়গায় খেলতে যায়, তারই বর্তমান কর্মকর্তারা ধরে করে পড়েছে প্রভাতকে স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।

ছেঁকে ধরেছে তারা, 'প্রভাতদা, আগের যাঁরা, তাঁরা কেউই প্রায় এদিকে নজর দেন না, কেউ কেউ বা অন্য জায়গায় চলে গেছেন, আমরা যা পারছি করছি। আপনি যখন আমাদের ভাগ্যে এসে পড়েছেন, আর ছাড়ছি না আপনাকে।'

'ছাড়ছি না ছাড়বো না।'

আজন্মের পরিচিত ঠাঁই যেন এই ক'টা উৎসুক ছেলের মধ্য দিয়েই স্নেহ-কঠিন দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়, 'ছাড়ছি না! ছাড়বো না।'

মা বলেন, 'আর ছাড়বো না।'

মন বলে, 'আর ছাড়বো না।'

আর অনেক যোজন দূরের আকাশ থেকে যে পাখীটিকে ধরে এনে খাঁচায় পুরেছে প্রভাত ? সেও বুঝি পরম নির্ভয়ে বুকের কাছে আশ্রয় নিয়ে মৌন সজল দৃষ্টিব মধ্যে বলে 'ছাড়বো না, ছাড়ছি না।'

এমন একান্ত করে প্রভাতের হয়ে যেতে না পারলে, মামাকে দেখে কি একটুও উতলা হত না মল্লিকা ? বলত না 'একবারটি নয় ঘুরে আসি, 'চিরকালের জায়গা—'

মামা তো তার ঘাতকের বেশে আসে নি, এসেছিল নিতান্তই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের রূপেই। কিন্তু মল্লিকা একবারও বলে নি,

'দেখতে ইচ্ছে করে সেই জায়গাটা।'

না, মল্লিকা তা' বলে নি। মল্লিকা তা বলতে পারে না।

মল্লিকা নীল আকাশের ওড়া পাখী ছিল না। ও যে পায়ে শিকলি বাঁধা খেলোয়াড়ের খেলা দেখানো পাখী ছিল। প্রভাত তাকে আপনার খাঁচায় এনে রেখেছে বটে, কিন্তু পায়ের শিকলি তো কেটে দিয়েছে। তাই না সে অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শুধু দুটি চোখের চাহনি দিয়েই আশ্বাস দেয় প্রভাতকে, 'ছাড়বো না ছাড়বো না।'

মল্লিকা সুখী। মল্লিকাকে সুখী করতে পেরেছে প্রভাত। মল্লিকা কৃতজ্ঞ। মল্লিকাকে কৃতজ্ঞ হবার অবকাশ দিয়েছে প্রভাত। মাঝে মাঝে একটু উল্টোপাল্টা আচরণ করে বটে, সেটা নিতান্তই ওর অভিমানী স্বভাবের ফল। তাই তো ভাবতে হচ্ছে প্রভাতকে, ছুটির দিনগুলো আর কাজের দিনের সন্ধ্যাগুলো মল্লিকার জন্যে রাখতে হবে।

ওই ক্লাবের ছেলেগুলোর কাছ থেকে কি করে ছাড়ান পাওয়া যাবে? আর আপাততঃ মল্লিকার এই অভিমানের কান্নার হাত থেকে?

অনেক চেষ্টায় আর অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয় প্রভাতকে, মল্লিকা কি ভেবেছে বিরক্ত হয়েছে প্রভাত? পাগল নাকি! মল্লিকার ওপর বিরক্তির প্রশ্ন ওঠেই না। কিন্তু এখানকার জ্ঞাতি সমাজ তো ভাল নয়? ওই পরিমলটার যদি পরীক্ষার ফল ভাল না হয়, সবাই দুষতে বসবে মল্লিকাকেই। বলবে—আড্ডা দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছে মল্লিকা। ওটা যে এই তিনবার ঘসটে ঘসটে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে, সে কথা কেউ মনে রাখবে না।

তবে? নিজেরা সাবধান হওয়াই ভাল।

ওকে ভয় পাওয়াবার জন্যেই বিরক্তির ভান দেখাতে হয়েছে প্রভাতকে। এইসব যুক্তির জাল বোনে প্রভাত। মল্লিকার কাছে বসে। একসময় মল্লিকা চুপ করে।

আর তারপর সহসা উঠে একেবারে নীচের তলায় নেমে গিয়ে করুণাময়ীর কাছে বসে।

প্রভাত আত্মপ্রসাদে পুলকিত হয়, নিজের বুদ্ধি আর যুক্তির

কার্য্যকারিতায়।

কিন্তু মল্লিকার ওই আকস্মিক কান্না কি সত্যিই প্রভাতের বিরক্তি প্রকাশের অভিমানে?

না, সে কান্না গভীরতর কোন অবচেতনার স্তর থেকে উঠছে এক অক্ষমতার নিরুপায়তায়?

—'বৌয়ের আওতা ছাড়িয়ে ছেলেকে একেবারে একা পাওয়া বড়ই শক্ত। ধারে কাছে বৌ নেই, ছেলের কাছে বসে দুটো সুখদুঃখের কথা কইলাম, কি হ'ল বৌয়ের একটু সমালোচনা, তার আচার আচরণের একটু নিন্দেবাদ, এমন মাহেন্দ্রক্ষণ জোটা দুষ্কর দিদি!

এ যুগের বৌগুলোই হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত সাধ্বী-সতী। স্বামীর একেবারে ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। ফাঁক পাওয়ার আশা দুরাশা।··· আগের আমলে শুধু শোওয়াটাই একসঙ্গে ছিল, তা'ও যতটা সম্ভব সন্তর্পণে। আর এখনকার আমলে দিদি, খাওয়া শোওয়া ওঠা বসা চলা ফেরা, বেড়ানো না বেড়ানো, সব যুগলে।···আদেখলে ছোড়ারা কেন যে আপিস যাবার সময়টুকুও বৌকে বগলদাবা করে নিয়ে যায় না তাই ভাবি। সেটুকু ফাঁক রাখে বোধহয়, বৌদের 'দিবে-নিদ্রে'র জন্যে। নইলে—শুনলে বিশ্বাস করবে, আমার ছেলে চুল ছাঁটতে গেল, বৌ সঙ্গে সঙ্গে চললো 'সেলুনে'। কেলাব লাইব্রেরী সিনেমা থিয়েটার, আত্মজনের বাড়ী, সর্বত্র চলল কাছা ধরে।··· কোথাও একলা ছাড়বে না। ছেলে তো 'মা' বলে ডেকে কাছে এসে বসতে ভুলেই গেছে!'

এক নাগাড়ে এই শতখানেক শব্দযুক্ত আক্ষেপোক্তিটি করে নিশ্বাস নিলেন করুণাময়ীর পাঠবাড়ীর বান্ধবী।

করুণাময়ী কিন্তু এ বিবৃতিতে সায় দেন না। বরং বলেন, 'আমার ছেলে বৌ কিন্তু অমন নয় ভাই।'

ছেলে বৌ বলতে অবশ্য করুণাময়ী তাঁর ছোট ছেলে বৌয়ের কথাই মনে নিলেন। কিন্তু বান্ধবীটি কথায় হেরে—ছোট হয়ে যাবার পাত্রী

নয়। তিনি সবেগে বলেন, 'রেখে দাও দিদি তোমার ছেলে বৌয়ের গুণগরিমা। বড় মেজ তো বুকের ওপর পাঁচীল তুলে বসে বসে গুণ দেখাচ্ছেন, আর এটিও কম নয়। তুমি দোষ ঢাকলে কি হবে, পাড়া পড়শী তো আর কানা নয়? ওইতো সবাই বলছিল, কাল তোমার ছেলে বৌ নাকি ওদের কেলাবের লাইব্রেরীতে গিয়েছিল, আর তোমার বৌ নাকি রাজ্যির ছেলেগুলোর সঙ্গে বাচালতা করছিল। তা' সাধ্যি আছে তোমার সেকথা তুলে বকতে, না সময় মিলছে ছেলেকে আড়ালে ডেকে অত আস্কারা দিতে মানা করতে? হুঁ! কিন্তু যাই বল ভাই, পাড়ার বৌঝিরা কেউ আর এখন 'বৌটি' নেই বটে, তবে কেলাবে লাইব্রেরীতে কেউ যায় নি অদ্যাবধি।'

এ অপমানে গুম্ হয়ে গেলেন করুণাময়ী, এ সংবাদে আহত। ভাবলেন, বলতে হবে প্রভাতকে। তাঁর অবশ্য বান্ধবীর মত অবস্থা নয়। কারণ তাঁর বৌ ঠিক শাস্ত্রসম্মত সাধ্বীসতী নয়। সে অত ছায়ার মত বরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে না। বরং একটু খামখেয়ালি মত। আছে তো আছে, নেই তো নেই। হয়তো বাগানেই ঘুরে বেড়ালো, হয়তো পুকুরঘাটে গিয়েই বসে থাকলো, হয়তো ছাতেই উঠে গেল।

তবে পরিমলটা বড্ড আসতে সুরু করছে। বয়সের ধর্ম আর কি! যেখানে রূপযৌবন, সেখানেই আকর্ষণ। বৌদিদি যে তোর থেকে পাঁচ সাত বছরের বড়, তাও হিসেব নেই। যাক্, ছেলেকে বৌয়ের আওতার বাইরে পাওয়া করুণাময়ীর পক্ষে শক্ত নয়।

ভাবলেন সবই বলবেন।

বলবেন বলেই ছেলেকে খুঁজছিলেন, ছেলেই তাঁকে খুঁজে বার করল এসে। রুদ্ধকণ্ঠে বলল—'মা, মল্লিকা কই?'

মায়ের সামনে এমন নাম করে উল্লেখ করে না প্রভাত, বলে, 'তোমার ছোটবৌ'। 'মল্লিকা' শুনে চমকে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন করুণাময়ী। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন

ঘরে নেই ?'

'না তো।'

'ছাতে গিয়ে বসে আছে তাহলে।'

'না না, দেখেছি।'

'তা' অত অস্থির হচ্ছিস কেন ? মেজ বৌমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে হয়তো।'

'না মা, না। সব জায়গায় খোঁজ করেছি।'

'শোন কথা। কর্পূর না কি যে, উপে যাবে। ঘাটে দেখেছিস্ ?'

'ঘাটে! সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, এখন ঘাটে ?'

'তা' আশ্চয্যি নেই। আজকাল তো ওইরকম খামখেয়ালীই হয়েছে। প্রথম প্রথম কী শান্ত, কী নরম, কী ভয় ভয় লজ্জা লজ্জা ভাব দেখালো, ক্রমেই যেন বিগড়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে। তোমাদেরও যেমন আদিখ্যেতা হয়েছে আজকাল! সখ করে বৌকে রাজ্যির বেটাছেলের সঙ্গে মিশতে দেওয়া! আরে বাবা, ওতে বৌ ঝি 'বার চট্‌কা' হয়ে যায়। ঘরতলায় মন বসে না। কাল তো শুনলাম—'

কিন্তু কি শুনেছেন, সে কথা কাকে আর শোনাবেন করুণাময়ী ? শ্রোতা তো ততক্ষণে টর্চ হাতে ঘাটের পথে হাওয়া!

হ্যাঁ করুণাময়ীর অনুমানই ঠিক।

ঘাটের ধারেই বসে আছে মল্লিকা। কিন্তু একাই কি বসে ছিল ? না টর্চের ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রভাতকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে ?

'এমন সময় এখানে কেন ?' এ প্রশ্ন না করে প্রভাত বলে ওঠে, 'এখানে কে ছিল ?'

'এখানে ?' হঠাৎ উদ্দাম একটা হাসিকে অদূরবর্ত্তী বাঁশ বাগানের ঝোড়ো হাওয়ায় মিশিয়ে দেয় মল্লিকা।

'এখানে ভূত ছিল। তোমার পদশব্দে ভয় খেয়ে পালালো।'

প্রভাত বসে পড়ে বাঁধানো ঘাটের পৈঠেয়। বলে, 'এমন সময় এখানে কী ?'

'মাছ ধরছি।'

'মাছ ধরছ?'

'হুঁ গো। দেখনা এই চার, এই ছিপ, এই বঁড়শি—'

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ! কী যে ভাবছিল প্রভাত!

সহসা প্রভাতও হেসে ওঠে।

বলে, 'একটি বৃহৎ রোহিত মৎসের গলায় তো জন্মের শোধ বঁড়শি গিঁথেছ, আবার কেন?'

মল্লিকা আবার হেসে উঠে বলে, 'কে কার গলায় বঁড়শি গিঁথেছে, কে কাকে ছিপে তুলেছে, সেটা বিচার সাপেক্ষ। নইলে আজ রাতের মাছ অসাবধানে বেড়ালে খেয়ে গেছে বলে সন্ধ্যেবেলা মাছ ধরতে আসতে হয়?'

এই ব্যাপার! ছি ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যায় প্রভাতের।

এমনি ছেলেমানুষ, আর এমন প্রেমে বিভোর স্ত্রীকে সে কিনা সন্দেহ করছিল? ভাবছিল বাড়ীতে আসতে বারণ করেছে বলে পরিমলটা হয়তো পুকুরঘাটে এসে জুটেছে, আর সময়ের জ্ঞান ভুলে আড্ডা হচ্ছে। খেয়ালই নেই যে অফিস থেকে ফেরার সময় উৎরে গেছে প্রভাতের।

যাঃ! পাঁচজনের পাঁচকথায় মনটা বিগড়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার পথে ফট্ করে এমন একটা কথা বলল মেজদা। তাই না ঘরে এসে বৌকে দেখতে না পেয়েই অমন উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল প্রভাত। কাকতালীয় ব্যাপার এইভাবেই ঘটে।

নইলে মল্লিকা যখন প্রভাতের খাওয়ার অসুবিধে নিরাকরণ করতে একটা বেপরোয়া ছেলেমানুষী করছে বসে, প্রভাত তখন এক তীব্র সন্দেহে নিজেকে জর্জরিত করছে।

না না। এখানে কেউ ছিল না।

টর্চের আলোর বিভ্রান্তি। গাছপালার ছায়া। বাঁশপাতার সরসরানি।

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। মল্লিকা প্রভাতের মন জানতে না পারুক,

প্রভাত তো নিজে জেনেছে। বোধকরি অপরাধ স্খালন করতেই আদরে ডুবিয়ে দেয় প্রভাত মল্লিকাকে।

কেড়ে রেখে দেয় ছিপ হুইল বঁড়শি। বলে 'থাক্ আর মাছে কাজ নেই, খাবার জন্যে আরও ভাল জিনিস আছে।'

করুণাময়ী ছেলের দেরী দেখে উদ্বিগ্ন চত্তে পিছু পিছু আসছিলেন, লজ্জায় ঘেন্নায় গর গর করতে করতে ফিরে যান। ততক্ষণে একটু একটু জ্যোৎস্না উঠেছে, কাজেই দৃশ্যটা একেবারে 'অদৃশ্য' নয়।

যে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠেছিল সেই সন্ধ্যায় ঝড় উঠল।

কাঁচা আম ঝরানো তোলপাড় করা ঝড়। হঠাৎ আচমকা।

জানলা দরজা আছড়ে পড়ে, দেয়ালে টাঙানো ছবি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে ঝনঝনিয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়। তারে শুকোতে দেওয়া কাপড় ফস্ করে উড়ে গিয়ে পাক খেতে খেতে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় কে জানে।

দরজার মাথার তাকে সাজানো পুতুল পড়ল গড়িয়ে, সাজা থেকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কড়ির কৌটো ছিটকে ধুলায় লুটালো।

আমবাগান আর বাঁশবাগানে চলতে লাগলো যেন ক্ষ্যাপা অসুরের রাগী লড়াই।

এ ঝড়ের মধ্যে বুঝি সেই দূর অরণ্যের আছড়ানি, দূর সীমান্তের হাতছানি। এ ঝড়ে অনেক দূরের রোমাঞ্চ আর অনেক দিনের ভুলে যাওয়া মদের স্বাদ। জানালাগুলো সব খুলে দেয় মল্লিকা।

প্রভাতের ঘুম গভীর। প্রথমটা জাগে নি, হঠাৎ ছবি পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল। চমকে উঠে বসে বলল, 'কী সর্বনাশ। ও কি? জানলা খোলা কেন? বন্ধ করো, বন্ধ করো।'

ঝড়ের শব্দে ওর কথার শব্দ ডুবে গেল।

ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে এল প্রভাত।

দেখল দুরন্তবেগে মল্লিকার চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, মল্লিকা জানালার শিক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মাথায় সেই ঝড় খাচ্ছে।

'কী হচ্ছে? তুমি কি পাগলা হয়ে গেলে?'

মল্লিকা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না এই উত্তালের মুখে তবু দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরল, ছাড়িয়ে নিতে গেল শিক থেকে কপাট বন্ধ করবে বলে। কিন্তু বড় দৃঢ়মুষ্টি মল্লিকার।

'মল্লিকা, এ কী সখ? চোখে মুখে ধূলো ঢুকে মারা যাবে যে!' নিজে ধূলোর ভয়ে চোখ বুজে মাথা নীচু করে বলে প্রভাত, 'দোহাই তোমার, জানালার কাছ থেকে সরে এস।'

সহসা ঘুরে দাঁড়ায় মল্লিকা। কঠিন গলায় বলে 'না।'

'না!'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। তুমি যাও। অন্য ঘরে চলে যাও। জানলা দরজা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোও গে। নয়তো মার আঁচল তলায়। সেই—তোমার উপযুক্ত ঠাঁই।'

'মল্লিকা!'

মল্লিকা আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে বাইরের দিকে মুখ করে। বন্যপশুর আর্তনাদের মত একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রভাত দাঁড়াতে পারছে না।

প্রভাত দাঁড়াতে পারে না। তবু ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। বলে, 'মল্লিকা, অসুখ করবে।...মল্লিকা, বাইরে থেকে কিছু ছিটকে এসে চোখে মুখে লেগে বিপদ ঘটাবে।'

মল্লিকা নিরুত্তর।

আর পারে না প্রভাত। 'বেশ যা খুশি কর।'

বলে সত্যিই পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এক এক সময় কী যে হয় ওর!

ওদের বংশে কেউ কি পাগল ছিল? শরীরে সেই রক্ত কণিকা বহন করে রয়েছে বলেই মাঝে মাঝে উন্মত্ততা জাগে ওর?

কখন যে ঝড় কমেছে, কখন যে তার আর্তনাদ থেমেছে, খুব স্পষ্ট মনে নেই প্রভাতের, শুধু মনে আছে অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি। আর

একবার ও ঘরে গিয়ে চেষ্টা করেছিল মল্লিকাকে জানলা থেকে সরাতে। পারে নি।

ঘুম ভাঙল প্রভাতের অনেক বেলায়।

তাড়াতাড়ি এঘর থেকে শোবার ঘরে গিয়ে দেখল, ঘর খালি। দেখে নীচে নেমে এল। আর নেমে এসে যে দৃশ্য দেখল তা'তে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না।

নীচের দালানে বড় একটা ধামা ভর্তি ঝড়ে পড়া কাঁচা আম, করুণাময়ী তার থেকে বেছে বেছে এগিয়ে দিচ্ছেন, আর মল্লিকা সেগুলো নিয়ে দ্রুত হস্তে ছড়াচ্ছে।

এ কী কাল রাত্রের সেই মল্লিকা? মল্লিকা কি বহুরূপী?

নাকি মাঝে মাঝে মল্লিকার উপর ভূতের ভর হয়?

কিন্তু মা সামনে, তাই সম্বোধনটা মল্লিকাকে করা চলে না, আবেগ আবেগ গলায় মাকেই বলে, 'মা, কাল সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে তুমি বাগানে নেমেছিলে?'

আমের সঞ্চয়ে পুষ্ট এবং বাহাদুরিতে হৃষ্ট করুণাময়ী হেসে বলেন, 'না নামলে? ঝড় থামার অপেক্ষায় থাকলে একটা আম চোখে দেখতে পেতাম? রাজ্যের ছোঁড়াছুঁড়ি এসে বাগান ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যেত না?'

'সে তো বুঝলাম। কন্তু গেলে কি করে?'

'কী করে আবার? যেমন করে ফি বছর যাই। তোর বৌদিরা তো আবার এদিকে অহঙ্কারের রাজা, ঠেকার করে একটা আম নেয় না, এদিকে তোর বড়দা মেজদার স্বভাব তো জানিস? আচার নইলে ভাত মুখে রোচে না। তা' এই কাঁচা আমের সময়—'

প্রভাত হেসে ওঠে।

'এদিকে তো বড় মেজ পুত্তুরের সাত শো নিন্দে না করে জল খাও না, অথচ তাদের মুখরুচির দায়ে প্রাণের ভয় তুচ্ছ জ্ঞান করে রাত দুপুরে ঝড়ের মুখে ছোটো আম কুড়োতে! তাজ্জব!'

করুণাময়ীর মন আজ প্রসন্ন। তাই এ কথায় অভিযোগ অভিমানের দিক দিয়ে না গিয়ে হেসে বলেন, 'তা' তাজ্জব বটে। বুঝবি এরপর এর

মানে . আগে ছেলের বাপ হ।'

প্রভাত লজ্জায় লাল হয়।

গোপন কটাক্ষে একবার মল্লিকার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সে মুখে কোনও বর্ণ বৈচিত্রের খেলা দেখতে পায় না। সে যেমন আনত মুখে হাত চালাচ্ছিল তেমনি চালাতেই থাকে।

অনেকক্ষণ পরে অন্তরালে দেখা হয়।

আস্তে বলে, 'রাতের ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে?'

মল্লিকাও আস্তে উত্তর দেয়। কিন্তু সেই মৃদুতার মধ্যে যেন অনেক যোজন দূরত্ব। মজবুত ইস্পাতের কাঠিন্য।

'ভূত কি ঘাড় থেকে সহজে নামে?'

প্রভাত এই দূরত্বের কাছে যেন একটু অসহায়তা বোধ করে, তাই জোর করে সহজ হতে চায়। বলে, 'তুমি তো দেখি ইচ্ছে করলেই ভূতকে ঘাড়ে তুলতে পারো, আবার ঘাড়ে থেকে নামাতেও পারো। সত্যি মাঝে মাঝে কী যে হয় তোমার!'

'কী হয়, সে সম্বন্ধে কি মনে হয় তোমার?'

'কী মনে হয় আসলে জানো? তুমি বড্ড বেশী সিরিয়াস।'

'জীবনটাকে অত ভারী ভাববার দরকারই বা কি? ইচ্ছে করলেই তো হালকা করে নেওয়া যায়, সহজ করে নেওয়া যায়।'

'সবাইয়ের পক্ষে হয় তো তা' যায় না।'

'ওটাও ভুল। হালকা হবো ভাবলেই হালকা হলাম, এর আর কি? চলো আজ সন্ধ্যায় কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা যাক। একঘেয়ে বাড়ী বসে থেকে থেকে—'

মল্লিকা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলে, 'বেড়াতে? কোথায়? হাওড়া ময়দানে?'

'হাওড়া ময়দানে!'

'তা' ছাড়া আর কোথায়? লোকালয়ে গেলেই তো নিন্দে? সেদিন একটু লাইব্রেরীতে গিয়েই তো—'

প্রভাত একথা বলতে পারে না, 'তোমার আচরণে যে কেমন একটা

ব্যালেন্সের অভাব মল্লিকা, তাইতো নিন্দে হয়। সেদিন লাইব্রেরীতে তুমি যে কী অদ্ভুত মাত্রাছাড়া বাচালতা করলে!' বলতে পারে না। শুধু বলে, 'আমাদের এই জায়গাটা কলকাতা সহরের প্রবেশ পথ হলে কি হবে, কড্ড বেশী ব্যাকওয়ার্ড যে। একটুকুতেই নানা কথা। কথার সৃষ্টি করে লাভ কি বল? তার চেয়ে সবাই যা করে তাই করাই ভাল নয় কি?'

'সবাই যা করে?' মল্লিকা নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে বলে, 'সেটা কি?

'ধর সিনেমা গেলাম। ওতে আর কেউ নিন্দে করতে আসবে না। নিজেরা তিনবেলা দেখছে সবাই।'

'সিনেমা। ওঃ!'

'কেন পছন্দ হ'ল না?'

'পছন্দ?' হঠাৎ হেসে ওঠে মল্লিকা। যেমন হঠাৎ হাসিতে মাঝে মাঝে মাঝে চমকে দেয় প্রভাতকে—তেমনি চমকে দেওয়া হাসি! হেসে বলে, 'সে কী! পছন্দ হবে না? কি বল? বরের সঙ্গে সেজেগুজে সিনেমা যাবো, এর থেকে পছন্দসই আর কি আছে?'

'তাহলে রাজী?'

'নিশ্চয়।'

'একেবারে টিকিট কেটে নিয়ে আসবো ত'হলে?' আর যতটা সম্ভব সকাল সকাল আসবো। তুমি কিন্তু একেবারে ঠিক হয়ে থেকো! ওই যা বললে—সেজে-গুজে—' একটু থেমে বলে, 'মাকে একটু তাক্ বুঝে, মানে আর কি মুড্ বুঝে জানিয়ে রেখো কেমন?'

'সেটা তুমিই রেখে যাও না?'

'আমি? আচ্ছা আমিই বলে যাবে।' বলে বটে তবে এই ভাবতে ভাবতে চান করতে যায়, মার মুড্টা পাবে তো? পেতেই হবে। রান্নার সুখ্যাতি করতে হবে প্রথমে, তারপর একটু ভাত চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। তাহলেই—

ছোট সুখ, ছোট ভাবনা।

নিতান্ত তুচ্ছতা দিয়ে ভরা বাংলার জেলেজলে কাদায় মাটিতে

গড়া অতি সাধারণ প্রভাত গোস্বামী।

আশ্চর্য যে, এই প্রভাত গোস্বামীই সেই হাজার মাইল দূরের দুর্দ্ধর্ষ বাঘের গুহা থেকে তার মুখের গ্রাস চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। কি করে পেরেছিল?

জল হাওয়া পরিবেশ পরিস্থিতি, এরাই কি মানুষকে ভাঙে গড়ে? আসলে মানুষের নিজস্ব কোনও আকার নেই? মাটি আর হাওয়া তাকে বীর করে, কাপুরুষ করে, ভীরু করে বেপরোয়া করে?

কিন্তু তাই কি?

যাইহোক আপাততঃ আজকে প্রভাত খুব একখান সাহসী পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করল। মাকে সোজাসুজি বলল, 'মা ওবেলা একটু সকাল সকাল আসবো। সিনেমা যাবো।'

করুণাময়ী অবশ্য এ সংবাদে প্রীত হলেন না। হনও না। বিরসকণ্ঠে বলেন, 'সিনেমা? এই তো কবে যেন গেলি?'

'আরে সে তো কতদিন!'

'তা বেশ যাবে যাও। রাত করে ফেরা, বৌকে নিয়ে একটু সাবধানে ফিরো। দিন কাল খারাপ!'

'কী মুস্কিল! দিনকালের আবার কি হলো?'

'হল নাই বা কেন? এই তো মেজবৌমা কাল বলছিল, দুপুরের ফাঁকে নাকি একটা সা-জোয়ান মত লোক আমাদের আম বাগানের ওদিকে ঘোরাঘুরি করছিল।'

'করছিল! অমনি! তোমার ওই মেজবৌমাটি হচ্ছেন এক নম্বরের গুজব সাম্রাজ্ঞী।'

'না না। ও বলল স্পষ্ট দেখেছে। বলল তার নাকি ভাব-ভঙ্গী ভাল নয়।'

প্রভাত হেসে উঠে বলে, 'অতিরিক্ত রহস্য সিরিজ পড়লেই এইসব দিবাস্বপ্ন দেখে লোকে। রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে গেল, উনি তার ভাবভঙ্গী অনুধাবন করে ফেললেন। যতো—সব!'

মেজবৌদির কথাকে চিরদিনই উড়িয়ে দেয় প্রভাত, আজও দিল।

তবে কিছুদিন আগে হলে হয়তো দিত না, দিতে পারত না। যখন সদাসর্বদা ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল তার ছায়াসঙ্গী।

মল্লিকাকে নিয়ে আসার পর থেকে অনেকদিন পর্য্যন্ত এমন ছিল। তখন মেজবৌদি এমন সংবাদ পরিবেশন করলে হয়তো হেসে ওড়াতে পারত না প্রভাত। ভয়ে সিটিয়ে উঠত।

চাটুয্যে এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবার পর থেকে সেই ভয়টা দূর হয়েছে প্রভাতের। আতঙ্ক আর তার ছায়াসঙ্গী নেই। বুঝেছে। চাটুয্যের দ্বারা আব কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তাদের। মল্লিকাব সুখ সৌভাগ্য দেখে মন পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার মামার। স্নেহের কাছে স্বার্থ পরাস্ত হয়েছে।

অতএব আবার পুরনো অভ্যাসে মেজবৌদির বৃথা ভয় দেখানোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। মা যে ততটা ভুরু কোঁচকান নি, এতেই খুসির জোয়ার বয় মাতৃগতপ্রাণ প্রভাতের। দাদাদের আর বৌদিদের দুর্ব্যবহারে বিক্ষত মাতৃহৃদয়ে, সদ্ব্যবহারের প্রলেপ লাগাবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে প্রভাত সেই কবে থেকে! তাই না মাকে এত মেনে চলা।

হট করে মল্লিকাকে নিয়ে আসায় তাতে একটা ছন্দপতন হয়েছিল বটে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় আর প্রভাতের আপ্রাণ চেষ্টায় সে ছন্দ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল অবশেষে।

করুণাময়ী ঈষৎ অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'সে যাইহোক সাবধানের মার নেই।'

'আচ্ছা বাপু আচ্ছা, যতটা পারবো সাবধান হবো।'

অফিস বেরিয়ে পড়ে প্রভাত।

খানিক পরেই গঙ্গাস্নান ফেরৎ আসেন করুণাময়ী একটু যেন হন্তদন্ত হয়ে। ডাক দেন 'ছোটবৌমা, ছোটবৌমা!'

মল্লিকা দোতলা থেকে নেমে আসে।

করুণাময়ী ব্যস্তভাবে বলেন, 'নীচেরতলায় বাগানের দিকের ঘরে ছিলে তুমি?'

মল্লিকা নির্লিপ্তভাবে বলে, 'কই না তো। এই তো নামলাম ওপর থেকে। কেন?'

'বাঁশঝাড়ের ওদিক থেকে হঠাৎ মনে হল কে যেন ওই ঘরের জানলার নীচে থেকে সরে গেল! কাল মেজবৌমাও বলছিল। দেখ দিকি ঘরের কোনও জিনিস খোয়া গেছে কিনা। আমাদের পাঠবাড়ীর গিন্নীর তো সেদিন জানলা দিয়ে এক আলনা কাপড় চুরি গেল। যেমন বুদ্ধি, জানলার কাছে আলনা! আঁকশি দিয়ে দিয়ে বার করে নিয়ে গেছে। তোমার এ ঘরে—'

'না নীচের ঘরে তো আমার কিছু থাকে না।'

কথাটা ঠিক। কোন কিছুই থাকে না ও ঘরে। নেহাৎ সংসারের বাড়তি 'ডেয়োঢাকনা' বোঝাই থাকে। জানলা দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বার করে নিয়ে যাবার মাল সে সব নয়।

তত্রাচ করুণাময়ী একবার সে ঘরে ঢোকেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস করেন। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে কোনও চোর ছ্যাঁচোড় তক্কে তক্কে ফিরছে। কাল মেজবৌমার কথায় কান দিইনি, আজ প্রভাতও সে কথা হেসে ওড়ালো, কিন্তু এ আমার নিজের চোখ। অবিশ্বাস করতে পারি না। কেমন যেন হিন্দুস্থানী মতন একটা লোক—'

মল্লিকা কিন্তু করুণাময়ীর বকবকানিতে কান করে না। নির্দিষ্ট নিয়মে ওঁর হাত থেকে গঙ্গাজলের ঘটি আর ভিজে কাপড় গামছাটা নেয়। উঠোনে নেমে কাপড়খানা শুকোতে দিয়ে আসে টান টান করে। বলে, 'আপনার উনুনে আগুন দিই?'

'দিও দিও। আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই। ভারী তো রান্না, আমার একলার আবার রান্না! একপাকে ফুটিয়ে নেব।'

কথাটা অবশ্য তেমন সমূলক নয়।

একলার জন্যে সাতখানি রাঁধেন করুণাময়ী। যদিও ছুতোটা করেন 'প্রভাত আমার ভালবাসে।' টুক্‌টুক্ করে রাখেন, সে সব প্রভাতের জন্য গুছিয়ে।

রাত্রে প্রভাতকে খেতেই হয়, সেই সুক্ত, পোস্তর বড়া, মোচা ছেঁচকি, কচুর শাকের ঘণ্ট।

রান্নার জায়গায় দৃষ্টিপাত করে করুণাময়ী বলে ওঠেন, 'মেতির শাক কটা রেখে গিয়েছিলাম, কই বেছে রাখনি ছোট বৌমা?'

'শাক!' মল্লিকা যেন ভেবে মনে আনতে চেষ্টা করে শাক বস্তুটা কি! যাত্রাকালে কি যেন একটা বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী, সে কি ওই শাকের কথা?

কিন্তু না, বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী অন্য কথা। শাকটা রেখেছিলেন ছোট বৌমার বিবেচনাধীনে। যার বিষয়ে বলে গিয়েছিলেন তার দিকে নজর পড়তে শিউরে ওঠেন, 'কি সর্বনাশ! সেই কাঁচা আমের কাঁড়ি ছায়ায় পড়ে আছে? রোদের দিকে টেনে দাওনি ছোট বৌমা? ছি ছি! মন তোমাদের কোন দিকে থাকে বাছা? অত করে বলে গেলাম।' নিজেই টেনে আনেন তিনি ঝুড়িটা।

মল্লিকার মনে পড়ে এই কথাটাই বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী।

কিন্তু মল্লিকার চিন্তাজগতে কাঁচা আমের ঝুড়ির ঠাঁই কোথায়?

করুণাময়ী সেই কথাই বলেন, 'তোমার তো সবই ভাল ছোট বৌমা, এই ভুলটাই একটা রোগ। মাথাটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কর দিকি!'

মল্লিকা উঠোনে এসে পড়া ভর দুপুরের প্রখর রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলে, 'করবো।'

করুণাময়ী বলেন, 'হ্যাঁ তাই বলছি। সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা না থিয়েটার কোথায় যেন যাবে শুনলাম। তা' আমি তো তখন পাঠ-বাড়ীতে যাবো। দোর জানলা সব ভাল করে বন্ধ করে সদরে তালা লাগিয়ে চাবিটা 'ও বাড়ী' রেখে যেও। আমিই যদি আগে আসি।...ভাল করে মনে রেখো, কি জানি তখন কোন মতলবে ঘুরছিল লোকটা। এই যে তোমরা সন্ধ্যেবেলা বাড়ী থাকবে না, জেনেছে হয়তো। তালায় চাবিটা লাগিয়ে তালা টেনে দেখে, তবে বেরিও।'

সাবধানের ত্রুটি করেন না করুণাময়ী। তাঁর জানার জগতে যে সব সাবধানতা আছে, তার পদ্ধতি শিক্ষা দেন তাঁর অবোধ ছোট

বৌকে। কিন্তু দরজা কি শুধু ঘরেই থাকে ?

আর সে দরজায় চাবি লাগাতে পারলেই সমস্ত নিরাপদ ?

প্রভাত আসছিল ভারী খুশি খুশি মনে। আজ একটা সুখবর পাওয়া গেছে অফিসে। বেশ কিছু মাইনে বেড়েছে।

ভাবতে ভাবতে আসছিল, বাড়ী গিয়ে মল্লিকাকে বলবে, 'রাতে আজ খুব ভাল করে সাজতে হবে তোমায় মল্লিকা! সেই তোমার ফুলশয্যার শাড়ীটা পরবে, খোঁপায় জড়াবে রজনীগন্ধার মালা কপালে চন্দনের লেখা। তোমায় দেখব বসে বসে।'

কিন্তু বাড়ী এসে সে কথা বলবার আর ফুরসৎই পেলনা সে। ওই সৌখিন কবিত্বটুকু ফলাবার আগেই চোখ ঝলসে গেল তার।

অপরূপ সাজসজ্জায় ঝলমলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মল্লিকা। পরণে পাতলা জরিদার শাড়ী। রজনী গন্ধার মালা জড়ানো শিথিল কবরী নয়, সাপিনীর মত কালো চকচকে জরি জড়ানো লম্বা বেণী।

ঠোঁটে গাঢ় রক্তিমা, নখে রঙের পালিশ। গালেও বুঝি একটু কৃত্রিম রঙের ছোঁয়াচ। সুর্মাটানা চোখে কেমন একটু বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে, 'কেমন দেখাচ্ছে ?

খুব কি ভাল লাগে প্রভাতের ? লাগে না। তবু—প্রভাত হাসে আর বলে, 'বড্ড বেশী রূপসী! একটু যেন ভয় ভয় করছে।'

'ভয়!'

'তাই তো! পথে নিয়ে বেরোতো সাহস হচ্ছে না!'

কিন্তু প্রভাতের সেই তুচ্ছ কৌতুকের কথাটুকু কি কোনও ক্রুর ভাগ্যদেবতাকে নিষ্ঠুর কৌতুকের প্রেরণা দিল ? তার ভয় এলো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে! লুটে নিয়ে গেল প্রভাতের জীবনের রং; ঈশ্বরের বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা।

সিনেমা হল থেকে প্রভাতের বাড়ী ফিরতে এই পথটা একটু গা ছমছমে বটে! এরই আশেপাশে নাকি হাওড়ার বিখ্যাত গুণ্ডা পাড়া।

কিন্তু সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখে তো আগেও ফিরেছে প্রভাত আর প্রভাতের পাড়ার লোকেরা।

ছুদিন আগেও লাস্ট শোয় ছবি দেখে এসেছে মেজদা মেজবৌদি—

তবু সবাই ধিক্কার আর ব্যাঙ্গের স্রোত বহালো।

'হবেই তো' সুন্দরী রূপসী বৌকে সঙ্গে করে রাত নটায় গুণ্ডাপাড়া দিয়ে···ছি ছি, এত কায়দাও হয়েছে একালের ছেলেদের!···হলো তো, বৌকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল, ভ্যাকা হয়ে দেখলি তো দাঁড়িয়ে?···হ্যাঁ তবু রক্ষে যে তোকে খুন করে রাস্তায় শুইয়ে রেখে যায় নি।···

আবার একথাও বললো, 'পাড়া কি এত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল, সত্যি, যে অতবড় কাণ্ডটা কারুর চোখে পড়লো না, অতখানি চেঁচামেচি কারুর কানে গেল না?···ভয়ানক একটা চেঁচামেচি ধ্বস্তাধ্বস্তি তো হয়েছে নিশ্চয়ই!'

চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি? হ্যাঁ, পুলিশকে তাই বলতে হয়েছে বৈকি।

বলতে হয়েছে একসঙ্গে চার পাঁচজন গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে—

কিন্তু প্রভাত তো জানে একটাই মাত্র লোক। যে লোকটা একখানা ছোট গাড়ী নিয়ে পথের একধারে চুপ করে বসেছিল চালকের আসনে, গাড়ীর দরজা খুলে। স্পষ্ট শাদা চোখে দেখেছে প্রভাত সেই খোলা দরজা দিয়ে ঝপ করে ঢুকে পড়েছে ঝলমলে ঝকঝকে, চোখে সুর্মা টানা মল্লিকা। আর প্রভাত?

প্রভাত তো তখন রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রঙিন মশলা দিয়ে মিঠে পান সাজাচ্ছিল। হঠাৎ যে মল্লিকার রঙিন মশলা দেওয়া মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

তাই তো প্রভাতকে ঠেলে পাঠিয়েছিল রাস্তার ওপারে পানের দোকানে। বলেছিল 'আমি দাঁড়াচ্ছি। দেরী করবে না কিন্তু।'

দেরী কি করেছিল প্রভাত? বড্ড বেশী দেরী? তাই ধৈর্য্য হারিয়েছিল মল্লিকা?

গাড়ীর নম্বর? না, সে আর দেখবার অবকাশ হয় নি প্রভাতের।

রাস্তা পার হবার আগেই হুস্ করে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল গাড়ীটা, দরজা বন্ধ করার রূঢ় একটা শব্দ তুলে। যে শব্দটা অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে প্রভাতের কানে। গাড়ীর পিছনে বৃথা ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু চালকের মুখটা দেখা হয়ে গিয়েছিল তার পাশের দোকানের আলোতে।

চিনতে পেরেছিল বৈকি। ওর সঙ্গে কতগুলো দিন একই জীপের মধ্যে গায়ে গায়ে বসে কত মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছে প্রভাত।

বৌ হারিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

পুলিশ কেস করতে হচ্ছে। হাওড়া অঞ্চলের অনেক গুণ্ডাকেই দেখতে যেতে হচ্ছে প্রভাতকে, সনাক্ত করতে। কিন্তু কই? সেই চার পাঁচটা লোককে তো—? নাঃ। তাদের বার করতে পারছে না পুলিশ।

হাওড়া অঞ্চলে দুর্বৃত্তের অত্যাচারের একটা খবর খবরের কাগজেও ঠাঁই পেয়েছে কোন একটা তারিখে। তা, ও আর আজকাল কেউ দেখে না। দেখেওনি, কেউ লক্ষ্য করে নি। কে কত লক্ষ্য করে?

নইলে প্রভাতের বাড়ীর পিছনের বাগানের মধ্যেকার ওই সর্টকাটটা ধরে তো পাড়ার কত লোকই বাস রাস্তায় যাওয়া আসা করে, কেউ তো তাকিয়ে দেখে নি ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে, ছেঁড়া চুলের নুড়ো, এঁটো শালপাতার ঠোঙা, আর বাজে কাগজের কুচোর গাদায় চার ইঞ্চি লম্বা চওড়া ওই কাগজের টুকরোটুকু পড়ে আছে কত বড় ভয়ঙ্কর একটা সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে।

তা' তারা দেখলেই কি ধরতে পারতো, কতখানি ভয়ঙ্করতা লুকিয়ে আছে ওই কাগজটুকুর মধ্যে। পারতো না। কী করে পারবে?

চিঠি নয়, দলিল নয়, শুধু দুটি বাক্য। নির্ভুল বানানে পরিষ্কার ছাঁদে লেখা। বাংলা নয় ইংরিজি অক্ষরে। তা' হোক, চিনতে ভুল হয় না প্রভাতের। এই এতগুলো দিনের মধ্যে মল্লিকার হাতের লেখা তো কতই দেখতে হয়েছে প্রভাতকে। বাংলা, ইংরিজি সবই। 'হাওড়া টকী' 'ইভনিং শো'। এই ছোট্ট দুটি কথাই তাই যথেষ্ট।